শিশুশ্রম প্রথার পক্ষে সওয়াল রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর

সংবাদ সংকলন : শিশুদের কাজ করতে না-বলাটা মোটেও বাস্তবোচিত নয়, এমনটাই মনে করেন আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য। গত ২ জানুয়ারি তিনি স্পষ্ট ভাষাতেই জানিয়েছেন, ''কাজ করো না, এটা আমরা তাদের বলতে পারি না। কারণ এতে তাদের পরিবারের আয় কমে যাবে।'' মুখ্যমন্ত্রী যুক্তি, কাজ চলুক, সঙ্গে শিক্ষাও চলুক। মুখ্যমন্ত্রীর এই সোজাসাপটা বক্তব্যে স্বভাবতই ক্ষুব্ধ বিরোধীরা। বিধানসভার বিরোধী দলনেতা পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের মতে, গরিবী দূর না-করে শিশুদের কাজ করার কথা বলছে সরকার। প্রসঙ্গত, প্রায় চার বছর আগেই ভারতে আইন করে শিশুশ্রম প্রথা বন্ধ করা হয়েছে। শিশুশ্রমের পক্ষে সওয়াল করাটা বে-আইনি কিনা তা অবশ্য আমাদের জানা নেই।

পঞ্চায়েতের ৫০০ স্কুলে দশম শ্রেণি

সংবাদ সংকলন : আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে রাজ্যে পঞ্চায়েত পরিচালিত দু'হাজার অষ্টম শ্রেণির বিদ্যালয়ের মধ্যে ৫০০টিকে মাধ্যমিক পর্যায়ে উন্নীত করা হবে বলে গত ১৭ জানুয়ারি জানিয়েছেন দফতরের মন্ত্রী আনিসুর রহমান। দেড় হাজার শিক্ষক ও এক হাজার শিক্ষাকর্মীও নিয়োগ করা হবে।

সমসূত্র

জানুয়ারি- ফেব্রুয়ারি ২০১১

ওয়েস্ট বেঙ্গল এডুকেশন নেটওয়ার্ক-এর মুখপত্র

আমাদের লক্ষ্য : শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য এমন এক সমাজ গড়ে তোলা যেখানে শিক্ষা সামাজিক ন্যায় ও সাম্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত

আত্মজদের নিয়ে রাস্তায় মায়েরা, ঘুম ভাঙল প্রশাসনের

অনাহারের জেরে গাজোলে সন্তান বিক্রির মেলা

সংবাদ সংকলন : পঞ্চায়েত প্রশাসনকে জানিয়ে গ্রামেই 'শিশু বিক্রির মেলা' বসালেন অসহায় আদিবাসী মহিলারা। অনাহার-অর্ধাহারে থাকার যন্ত্রণা সইতে না পেরে এই 'সোনার বাংলা'য় অভাবী কৃষকের আত্মহত্যা, স্বেচ্ছামৃত্যুর আর্জি বা সন্তান বিক্রির চেষ্টার ঘটনা নতুন কিছু নয়। কিন্তু গ্রাম বাংলারই কোনও এক অজ্ঞাত-অপাঙক্তেয় আদিবাসী গ্রামের সমস্ত মানুষজনই অভাবের জ্বালা সইতে না পেরে নিজের সন্তান-সন্ততিদের বিক্রি করে দেওয়ায় সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলবেন এবং গ্রামের রাস্তায় সারিবদ্ধভবে দাঁড়িয়ে কোলের শিশুটিকে অর্থের বিনিময়ে 'দান' করার জন্য খদ্দের খুঁজবেন, শুক্রবার এমনই নজিরবিহীন ঘটনার সাক্ষী রইলেন মালদহের গাজোলবাসী।

মালদহ শহর থেকে প্রায় ৬০ কিলোমিটার দূরে গাজোল থানার দেওতলা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা। রাজ্য সড়ক ছেড়ে প্রায় চার কিলোমিটার কাঁচা রাস্তা পায়ে হেঁটে পার হলেই মিলবে আর এক নতুন আমলাশোল। গ্রামটির নাম বানদিঘি। অনাহারক্লিষ্ট মানুষজন বসবাস করেন এই আদিবাসী গ্রাম বানদিঘিতে। খাস জমির উপর গড়ে উঠেছে আদিবাসী বসতি। ৬০টি বাড়ি আছে। কাঁচা মাটির দেওয়াল আর খড়ের ছাউনি। নিজেরাই বেঁধেছেন ঘর। অজগ্রামটি চেনেন না প্রশাসন বা পঞ্চায়েতের কেউ। বিদ্যুৎ ওঁদের স্বপ্ন। পানীয় জল আবার কী! পুকুর তো রয়েছে। স্কুল, হাসপাতাল, চিকিৎসক, ওষুধপত্র - এইসব সরকারি সুবিধা যে তাঁরাও দেশের নাগরিক হিসাবে পেতে পারেন, সেটিও জানেন না ধাবরু সোরেন, চুরকা হেমরম, মারাং সোরেন, পুটিয়া সোরেন, মেলা কিসকুরা। খাস জমিতে ঘর বাঁধলেও তাঁরা জমির পাট্টা পাননি। ৬০টি পরিবারে রয়েছেন ৪০০ মানুষ। পুরুষ ২১০ জনের মধ্যে অধিকাংশই ভিন রাজ্য দিল্লি, মুম্বাই, পাঞ্জাব পাড়ি দিয়ে আর ফেরেননি। মহিলার সংখ্যা ৭৫ জন। আর তাঁদের মোট শিশুর সংখ্যা ১০৫। খাবার জোটে না। শালপাতা, কচুশাক সেদ্ধ করে খেয়ে আর কতদিন বাঁচবেন। অর্ধাহারে থাকে ওই ১০৫টি শিশু। পরনে একটা ছেঁড়া কাপড়ও জোটে না। বয়স্ক আদিবাসী পুরুষ-মহিলারা পরনে তুলেছেন ছেঁড়া চট, যা ধানের বস্তা কেটে তৈরি করা। এ এক অদ্ভুত দৃশ্য! যেন আদিম যুগের কোনও এক জঙ্গলে গাছের ছাল, লতাপাতা গায়ে জড়িয়ে দিন কাটাচ্ছেন বানদিঘির মানুষজন। খবর পেলে ছুটে আসতে

শেষাংশ ৭ পাতায়

বিয়ের নামে পাচারের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত

হরিশ্চন্দ্রপুরে নাবালিকার বিয়ে রুখল পুলিশ

সংবাদ সংকলন : ১১ বছরের এক নাবালিকাকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে বিয়ে দেওয়া হচ্ছিল মালদা শহর থেকে ৮৬ কিলোমিটার দূরে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার বিষ্ণুপুর-কাটাবাড়ি গ্রামে। স্থানীয় গ্রামবাসীদের কাছ থেকে খবর পেয়ে পুলিশ ওই গ্রামে পৌঁছে পাত্রসহ পাঁচ জনকে গ্রেপ্তার করে এবং মেয়েটিকে একটি হোমে পাঠিয়ে দেয়। চাঁচলের এসডিপিও সন্দীপ মন্ডল জানিয়েছেন, অভাবের তাড়নায় মেয়েটির বিয়ে ঠিক করেন তার মা আমুকি রায় রাজস্থানের পাত্র লচ্ছি সিং-এর সাথে। তার আরও দু'টি মেয়ে আছে। তার স্বামী দিল্লিতে কাজ করতে গিয়ে দীর্ঘদিন নিখোঁজ। পুলিশ গ্রামে পৌঁছলে ভিনদেশি পাত্র ও তার আত্মীয়েরা পালাবার চেষ্টা করে। কিন্তু পুলিশ তাদের ধরে ফেলে। মেয়ের মা জানিয়েছে, বড় মেয়ের বিয়েতে কোন খরচ হচ্ছিল না। পাত্রপক্ষই বিয়ের সব খরচ বহন করেছিল। দিনমজুরি করে চলে তার। বিয়েটা হয়ে গেলে সে একটু রেহাই পেত। মালদা জেলার দারিদ্রের সুযোগ নিয়ে বিয়ের নামে মেয়েপাচার রুখতে গ্রামে গ্রামে প্রচারাভিযান চলছে। একটি টাস্কফোর্সও গঠন করা হয়েছে। এই ঘটনা তারই ফসল বলে মনে করা হচ্ছে।

(প্রাত্যহিক সংবাদ, ১৮.০২.১১)

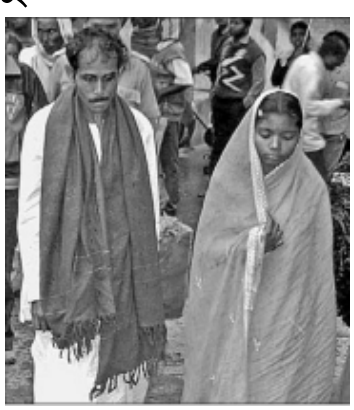

বিয়ের অভিযোগে ধৃত লচ্ছি সিং ও সেই নাবালিকা। - গৌতম কর্মকার

শিশুকন্যা বিক্রির অভিযোগে ধৃত বাবা

সংবাদ সংকলন : দ্বিতীয় সন্তানও মেয়ে হওয়ায় জন্মের পরদিনই স্ত্রীর অজ্ঞাতসারে সদ্যোজাতকে বিক্রি করে দেয় বাবা। পূর্ব মেদিনীপুরের রামনগরের মৈতনা অঞ্চলে গত প্রজাতন্ত্র দিবসের ঘটনা। স্থানীয় বাসিন্দারা অভিযুক্ত বাবা গৌতম সাউ ওরফে স্বপনের উপরে ক্ষুব্ধ হয়ে গ্রামে বিচারসভা বসান। সেখান থেকেই পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে। ■ **পৃষ্ঠা ৭: যমজ মেয়ে নিয়ে লড়াই সেরিনার।ক**

স্কুলে কোনপ্রকার শারীরিক ও মানসিক শাস্তিপ্রদান আর নয়

বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে শিশুদের দাবি নিয়ে ইস্তাহার প্রকাশ

নিজস্ব সংবাদদাতা : শিশুদের ভোটাধিকার নেই। তাই ওদের কথা শোনার তেমন গরজ নেই কোন ভোটপ্রার্থীর বা রাজনৈতিক দলের। কিন্তু শিশুদেরও নানা সমস্যা আছে। তাদেরও কিছু দাবি আছে। আগামী রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক দলগুলির কাছে তা তুলে ধরতে এবার শিশুরা নিজেরাই সরব হল। গত ২৫ ফেব্রুয়ারি কলকাতা প্রেস ক্লাবে অনুষ্ঠিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে বিভিন্ন জেলার শিশুরা একত্র হয়ে রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের কাছে তাদের বক্তব্য তুলে ধরে। 'বিনাব্যায়ে শিশুর বাধ্যতামূলক শিক্ষা অধিকার আইন, ২০০৯'-এর সঠিক রূপায়ণের দাবির পশাপাশি, বাল্যবিবাহ বন্ধ, শিশুশ্রম বন্ধ, শিশুর ওপর শারীরিক এবং মানসিক নির্যাতন বন্ধ, উপযুক্ত খেলার মাঠ সহ নানা দাবি নিয়ে প্রকাশ হয় তাদের ইস্তাহার। শিশুরা নিজেরাই তাঁদের দাবি সম্মলিত ইস্তাহার প্রকাশ করে তাঁদের দাবি ও সমস্যার কথা বলে। উত্তর ২৪ পরগণা জেলার নবম শ্রেণির ছাত্র অর্ধেন্দু বারিক, মুর্শিদাবাদ জেলার নবম শ্রেণির ছাত্র পাইলট হোসেন, হুগলী জেলার নবম শ্রেণির ছাত্রী, বিশেষ চাহিদা সম্পদ শিশু, রিকু নস্কর বিভিন্ন জেলার শিশুদের পক্ষে দাবিগুলি তুলে ধরে। এই সাংবাদিক সম্মেলনের উদ্যোক্তা ওয়েবেন।

ওয়েবেনের উদ্যোগ

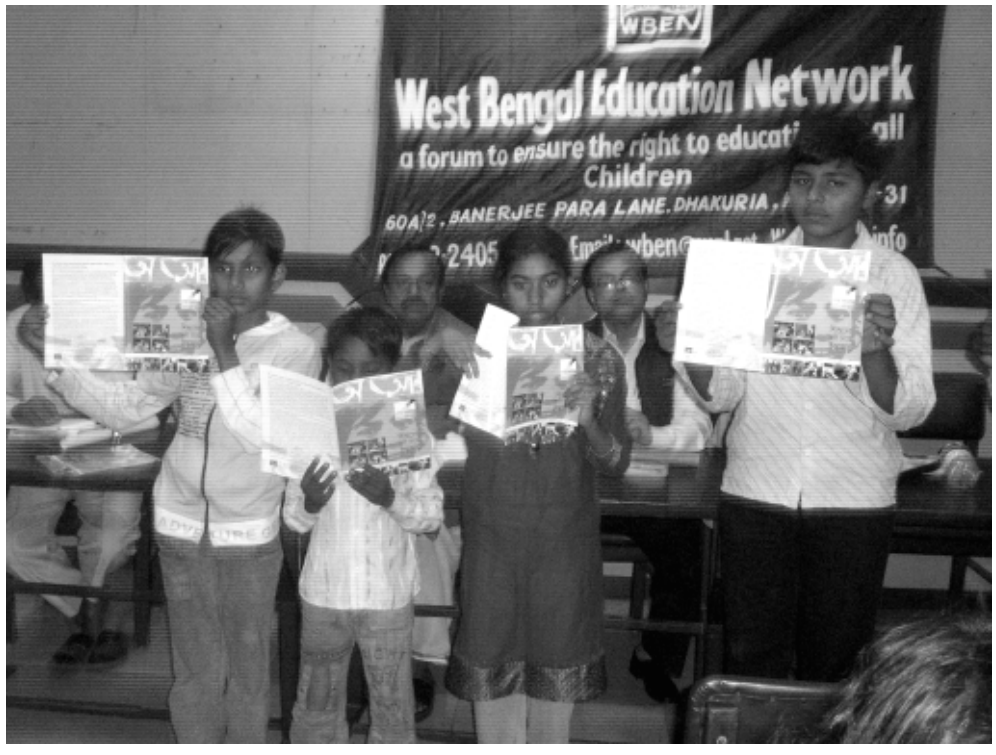

রাজ্যের মোট ৯টি জেলায় ইতিপূর্বে ওয়েষ্ট বেঙ্গল এডুকেশন নেটওয়ার্কের (ওয়েবেন) উদ্যোগে শিশু সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনগুলি থেকে উঠে আসা তাঁদের সমস্যা ও দাবি নিয়েই এই ইস্তাহার প্রকাশ করা হয়। এই ইস্তাহারে শিশুদের নিজেদের দাবির পাশাপাশি শিশুদের সমস্যা সমাধানে ওয়েবেন-এর পক্ষেও বেশ কিছু দাবি রাখা হয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম শিক্ষা অধিকার আইনের সঠিক প্রয়োগ, রাজ্য শিশু অধিকার সুরক্ষা আয়োগ গঠনের দাবি অন্যতম।

নির্বাচন এদের জীবনে কি সত্যিই কোন পরিবর্তন আনবে ?

শিশুদের নানা সমস্যা থাকলেও সেই সমস্যা সমাধানের জন্য শিশুদের মতামত কখনোই গুরুত্ব পায় না। আন্তর্জাতিক শিশু অধিকার সনদে শিশুদের অধিকার গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করার কথা বলা হলেও তাদের সেই অধিকার বাস্তবে কখনোই রূপায়িত করার চেষ্টা দেখা যায় না। শিশুরা মোট জনসংখ্যার ৪০ শতাংশ, কিন্তু তাদের ভোটাধিকার না থাকায় রাজনৈতিক দলগুলিও তাঁদের সমস্যাকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনার মধ্যে আনার প্রয়োজন বোধ করে না।

এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্যের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলিকে আমন্ত্রণ জানানো হলেও কেবলমাত্র এস. ইউ. সি. আই (কমিউনিষ্ট) দলের পক্ষে তপন সামন্ত এবং তৃণমূল তৃণমূল দলের তারক ব্যানার্জী (কাশিপুর অঞ্চলের বিধায়ক) উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা দু'জনেই শিশুদের দাবিগুলির প্রতি সমর্থন জানান। এছাড়া এই সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন চাইল্ড রাইটস অ্যান্ড ইউ (ক্রাই)-র পক্ষে সত্যগোপাল দে এবং নাফরে জন আন্দোলনের কেন্দ্রীয় সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য গৌরগোপাল সরদার। উপস্থিত ছিলেন ওয়েবেনের আহ্বায়কবৃন্দ সুবীর দে, দীপালি নন্দী, রুহুল আমীন এবং প্রাক্তন আহ্বায়ক ও বর্তমান সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য স্বপন পন্ডা, সেভ দ্য চিলড্রেন-এর পক্ষে চিত্ত সাধু, চাইল্ড রাইটস অ্যান্ড ইউ-র পক্ষে কিংশুক ভট্টাচার্য্য।

ওয়েবেন-এর পক্ষে প্রকাশিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ''১ এপ্রিল, ২০১০ থেকে 'শিশুর বিনা ব্যয়ে বাধ্যতামূলক শিক্ষা অধিকার আইন, ২০০৯' কার্যকর হলেও আমাদের রাজ্যে এই আইনের বিভিন্ন ধারা লঙ্ঘন করে ভর্তি পরীক্ষা, ভর্তি ফি নেওয়া হচ্ছে। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ শিক্ষা দপ্তর থেকে কোনো বিজ্ঞপ্তি না পাওয়ার অজুহাতে এবং বিদ্যালয় পরিচালন কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যথেষ্ট পরিমান টাকা ভর্তির জন্য দাবি করছে এবং ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকরা বাধ্য হয়ে টাকা দিয়ে ভর্তি করাচ্ছেন। ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অফ এডুকেশনাল প্ল্যানিং এ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন-এর প্রকাশ করা সাম্প্রতিক শিক্ষা উন্নয়ন সূচক অনুযায়ী আমাদের রাজ্যের অবস্থান সবার শেষে। মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক জানিয়েছে, গত এক বছরে (২০০৯-১০) দেশের ২৮টি রাজ্য এবং সাতটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মোট ৬৩৫টি জেলায় প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত সমীক্ষা চালানো হয়। এই রিপোর্ট অনুযায়ী আয়তনে বড় যে ২১টি রাজ্যের তালিকা দেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে শিক্ষার সুযোগ তৈরিতে প্রাথমিক স্তরে সপ্তম হলেও উচ্চ প্রাথমিকে রাজ্যগুলির মধ্যে একেবারে শেষে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ। শিক্ষা অধিকার আইনের ১৭নং ধারায় বিদ্যালয়ে শারীরিক ও মানসিক শাস্তি নিষিদ্ধ করা হলেও সংবাদবত্রের পাতায় বিদ্যালয়ে শারীরিক ও মানসিক শাস্তির খবর নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর উচ্চ আদালতের নির্দেশে বিদ্যালয়ে শারীরিক ও মানসিক শাস্তি বন্ধে যে বিজ্ঞপ্তি দিয়েছেন, সেখানেও আইনের মূল ভাবনার পরিপন্থী নির্দেশ রয়েছে।

হোটেল থেকে গ্যারেজ, কারখানা, ইটভাটা সর্বত্র শিশুশ্রমিকের দেখা মেলে। ১৯৯১ সালের জনগণনায় যেখানে এ রাজ্যে শিশু শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ৭,১১,৬৯১ জন, সেখানে ২০০১ সালের জনগণনায় শিশু শ্রমিকের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৮,৫৭,০৮৭ জন। শিশুপাচারে এ রাজ্য যথেষ্ট এগিয়ে। বিধানসভায় এক প্রশ্নের উত্তরে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, ২০০৯ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে ২০১০ সালের জানুয়ারি মাস পর্যন্ত এ রাজ্য থেকে ৬৩২৮ জন শিশু পাচার হয়েছে, এর মধ্যে মাত্র ১৪২৫ জন শিশুকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। জাতীয় পরিবার স্বাস্থ্য সমীক্ষা-৩ (২০০৫-০৬) অনুযায়ী রাজ্যে ৫৩.৩ শতাংশ ক্ষেত্রে বাল্যবিবাহের ঘটনা ঘটছে। ১-৫ বছরের শিশুদের ২২.৬ শতাংশ চরম অপুষ্টির শিকার। এরাজ্যে শিশুদের গড় রক্তাল্পতা ৭৮ শতাংশ। শিশুদের এই সকল সমস্যা সমাধানে নানা পরিকল্পনা নেওয়া হলেও শিশুদের কথা সেখানে গুরুত্ব পায় না।''

তাই সব রাজনৈতিক দলগুলির কাছে শিশুদের সমস্যা তুলে ধরতেই তাঁরা এই উদ্যোগ নিয়েছেন বলে ওয়েবেন-এর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

দৈহিক ও মানসিক নির্যাতন নিবারণ সংক্রান্ত ঃ নির্দেশিকা ঃ

পত্রাঙ্ক নং ২৬১১-জিএ তারিখ কলকাতা. ২২ জানুয়ারী, ২০০৯
হইতে ঃ শিক্ষা অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ
সমীপে ঃ ১) সকল সভাপতি, জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদ
২) সকল জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক শিক্ষা)
৩) সকল জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (প্রাথমিক শিক্ষা)

সংশ্লিষ্ট সকলকে জানানো হচ্ছে যে জাতীয় শিক্ষানীতি এবং শিশুর অধিকার সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক সম্মেলন হতে উদ্ভুত সিদ্ধান্ত অত্যন্ত স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছে যে যে কোনো ধরনের দৈহিক নির্যাতন শৈক্ষিক পদ্ধতি ও নীতি হতে বর্জন করতে হবে। বস্তুতঃ বিদ্যালয়ে ছাত্র / ছাত্রীদের ওপর শারীরিক নির্যাতন বিষমভাবে দৈহিক এবং মানসিক আঘাত আনে যা বর্দ্ধমান শিশুর স্বাভাবিক ব্যক্তিত্ব বিকাশে প্রবল প্রতিবন্ধক। বিষয়টি বিবেচনায় রেখে উক্ত বিষয়টির প্রতিষোধক হিসাবে নিম্নে প্রদত্ত নির্দেশাবলী

১) ধারাবাহিক প্রচার ও অবহিতকরণের মাধ্যমে প্রত্যেকটি ছাত্রকে দৈহিক নির্যাতনের বিরুদ্ধাচরণ করার বিষয়ে ক্ষমতায়িত করা প্রয়োজন এবং লক্ষ্য করা প্রয়োজন যাতে করে প্রত্যেকটি ছাত্র / ছাত্রী যদি কোনো শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়, তৎক্ষনাৎ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের গোচরে আনতে সচেষ্ট হয়।

২) প্রত্যেকটি বিদ্যালয় শিশুর মানসিক বিকাশের পক্ষে যেন আদর্শ সহায়ক শক্তি হয়ে উঠতে পারে।

৩) প্রতিটি বিদ্যালয় একজন শিক্ষক উপদেষ্টাকে চিহ্নিত করবে যার কাছে ছাত্ররা উক্ত উপদেষ্টার সহানুভূতিশীল বিবেচনার জন্য তাদের অনেক গোপন তথ্য প্রকাশ করতে পারে। এই বিষয়ে প্রতিটি বিদ্যালয়ে একটি অভিযোগ জানানোর নির্দিষ্ট বাক্স রাখার প্রয়োজন যেখানে ছাত্র/ছাত্রীরা অকপটে তাদের সমস্যার বিষয়গুলো লিখিতভাবে জানাতে পারবে। পরবর্তী ধাপে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক-উপদেষ্টা ছাত্র/ছাত্রীর নামধাম গোপন রেখে উদ্ভুত সমস্যার প্রতিবিধান করবেন।

৪) অভিভাবক-শিক্ষক সমন্বিত মাসিক সভার আয়োজন করতে হবে অথবা গ্রাম শিক্ষা সমিতি এবং ওয়ার্ডশিক্ষা সমিতি যৌথভাবে বসে অভিযোগ/অনুযোগের প্রতিবিধানে উপযুক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করবেন।

৫) অভিভাবক-শিক্ষক সমন্বিত সভাকে ইতিবাচক উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে যাতে করে ছাত্রছাত্রীরা লিখিত অভিযোগ/অনুযোগের সঠিক সমাধান সুনিশ্চিত করা যায়।

৬) শিক্ষা অধিকর্তার কারন ছাত্রদের অভিযোগ/অনুযোগ সংক্রান্ত সমস্যা প্রতিবিধানের রূপরেখা নির্ধারণ করবে এবং বিষয়টির মোকাবিলার জন্য উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণের দিশা নির্ধারণ করবে।

উপরোক্ত বিষয়সমূহ অত্যন্ত নিবিড়ভাবে অনুধাবন করে প্রতিটি অনুমোদিত এবং অদুদান প্রাপ্ত/না অনুদান প্রাপ্ত বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে সুনিশ্চিত করতে হবে যাতে করে প্রত্যেক ছাত্র/ছাত্রী অযথা শারীরিক ও মানসিক হয়রানির শিকার না হয় যা কিনা শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের পরিপন্থী এবং শিশুর স্বাভাবিক শারীরিক বিকাশ ও মানসিক বিকাশের প্রবল প্রতিবন্ধক।

সংশ্লিষ্ট সকল শিক্ষা সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গকে স্মরণে রাখতে হবে যে 'শিক্ষার অধিকার' নিয়েই একটি শিশু বা একটি ছাত্র বিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণের জন্য প্রবেশ করে। সুতরাং শিশুদের সাথে আচরণের ব্যাপারে শিক্ষক এবং শিক্ষাদরদী ব্যক্তিবর্গকে শিশুর 'শিক্ষার অধিকার'কে সুনিশ্চিত করার জন্য যথেষ্ট পরিমাণে সংযত এবং সংবেদনশীল হতে হবে।

স্বাঃ/-
দিব্যেন মুখার্জ্জী
শিক্ষা অধিকর্তা
শিক্ষা অধিকার
পঃ বঃ সরকার

- আনন্দবাজার পত্রিকা ১৫.০১.১১

স্কুলে কোনপ্রকার শারীরিক ও মানসিক শাস্তিপ্রদান নয়

পশ্চিমবঙ্গ সরকার
বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর
জনস্বার্থে প্রচারিত

বিনাব্যয়ে বাধ্যতামূলক শিশুর শিক্ষার অধিকার আইন, ২০০৯-এর ১৭ নং ধারা অনুযায়ী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কোন পড়ুয়ার উপর কোন প্রকার শারীরিক অত্যাচার ও মানসিক নির্যাতন নিষিদ্ধ। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকেও এই বিষয়ে 09-SE (S)-SL/5S-116/10 নং এক বিজ্ঞপ্তি ৬ জানুয়ারী ২০১১ তারিখে প্রকাশিত হয়েছে। এই সম্পর্কে বিশদে জানা যাবে www.wbsed.gov.in ওয়েবসাইটে।

এই বিজ্ঞপ্তি মুখ্য বৈশিষ্ট্যগুলি হল ঃ

শারীরিক অত্যাচার কি ?
শারীরিক অত্যাচার হল কোন পড়ুয়ার ওপর যে কোনভাবে, ইচ্ছাকৃতভাবে কষ্ট দেওয়া বা আঘাত করা যেমন-বেত দিয়ে বা ধাতব বস্তু দিয়ে মারধর এর মধ্যে অন্তর্গত। পড়ুয়াকে ধাক্কা দেওয়া, পিছনে সপাটে মারধর করা, চড় মারা, চিমটি কাটা, চুল ধরে টানা ইত্যাদিও শরীরিক অত্যাচারের মধ্যে পড়ে।

মানসিক নির্যাতন কি ?
মানসিক নির্যাতন হল ইচ্ছাকৃত বা সচেতনভাবে মানসিক চাপ পড়ুয়ার ওপর সৃষ্টি করা যা তার বৌদ্ধিক ও মানসিক স্বাস্থ্যকে ক্ষতি করে। কোন পড়ুয়াকে কটাক্ষ করা, কথার দ্বারা আঘাত দেওয়া ও অন্যদের সামনে তার মর্যাদাহানি করাও মানসিক নির্যাতনের মধ্যে পড়ে।

কে অভিযোগ করতে পারে ঃ
বাবা-মা বা অভিভাবক বিদ্যালয় পরিচালন কমিটির কাছে অভিযোগ জানাতে পারেন।

আইনের অবমাননা বা উল্লঙ্ঘন হলে কি কি পদক্ষেপ নেওয়া যাবে ?
জেলা অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক বিষয়টি তদন্ত করার পর বিদ্যালয় পরিচালন কমিটির কাছে অভিযুক্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা/বিদ্যালয় পরিচালন কমিটির সদস্যদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য প্রস্তাব পেশ করবেন।

বিদ্যালয় পরিচালন কমিটির কর্তব্য কি কি ?
বিদ্যালয় পরিচালন কমিটি শিক্ষক-শিক্ষিকার চাকরীর নিয়মবিধি অনুসারে শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগটি পেশ করবেন।

বিদ্যালয় পরিচালন কমিটির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কোথায় আবেদন করবেন ? সংশ্লিষ্ট জেলা অবর বিদ্যালয় পরিদর্শকের কাছে আবেদন জানাতে পারবেন।

নিম্নলিখিত বিষয়গুলি শারীরিক ও মানসিক অত্যাচারের আওতায় পড়ে না :
- শিক্ষক-শিক্ষিকা, বাবা-মা কে পড়ুয়ার পড়াশোনার ক্ষেত্রে শাস্তিমূলক পদক্ষেপের বিষয়ে অবগত করান।
- অভিভাবকদের মিটিং-এ বাবা-মাদের ডেকে পাঠান যাতে তারা পড়ুয়ার শিক্ষা ও বৌদ্ধিক প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারেন।
- আর্থিকভাবে দণ্ড বা জরিমানা প্রযোজ্য যা বিনাব্যায়ে শিক্ষার ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করবে না।
- শ্রেণিকক্ষ, খেলাধূলা বা অন্যান্য আনুষঙ্গিক কর্মসূচি থেকে অস্থায়ীভাবে শৃঙ্খলাভঙ্গকারী পড়ুয়াদের বিরত রাখা।
- পাঠ্যক্রম বহির্ভূত কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ।

বিশদে জানার জন্য বিনাব্যয়ে বাধ্যতাভূলক শিশুর শিক্ষার অধিকার আইন, ২০০৯ এবং বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার নীতি বিষয়ক বিজ্ঞপ্তি নং 09-SE (S)-SL/5S-116/10, তাং ৬ জানুয়ারি, ১০১১ দ্রষ্টব্য।

- আনন্দবাজার পত্রিকা ১৩.০১.১১

মানবিকতার চরম অবক্ষয়ের এই সময়ে এমন কিছু মানুষের দেখা মেলে যাঁরা স্রোতের প্রতিকূলে সাঁতরে আনন্দ পান। এঁরা প্রচারের আলোর দূরে থেকে কাজ করে যান। সংবাদ মাধ্যমের আন্তরিক প্রচেষ্টায় মাঝে মাঝে এঁদের সাক্ষাৎ মেলে। বর্তমান সংকলনে এমন কিছু মানুষেরই, আসুন, আমরা মুখোমুখি হই। — সম্পাদক

অন্ধকার জীবনে আলোর দিশারী নাসিমা

সিদ্ধার্থ রায়

উন্নত জীবনের স্বপ্ন নিয়ে সরকারকে ক্ষমতায় আনে জনতা। স্বপ্নের কতকটা পূরণ হয়, কতকটা আবার অধরাই থাকে। কিন্তু আম-জনতার ভিড়ে মিশে থাকা ওঁরা কেমন থাকেন? ওঁদের জীবনে কি পরিবর্তন আসে? বিহারের কোটি মানুষের মধ্যে মিশে থাকা ওঁদের সঙ্গে কথা বলতেই পায়ে পায়ে হাজির হয়েছিলাম নাসিমার দরজায়। গর্বের সঙ্গে যিনি বলে থাকেন, হ্যাঁ, আমি নিষিদ্ধপল্লির মেয়ে। এটা আমরা লজ্জা নয়, পরিচয়।'

মজফ্‌ফরপুরের চতুর্ভুজে নাসিমার অফিস 'পরচম'-এ বসে কথা হচ্ছিল। জানালেন, কী ভাবে নিষিদ্ধপল্লির অন্ধকারে বেড়ে উঠেছেন। গল্পের মতো বলতে থাকলেন, 'জানেন, ছোটবেলায় দরজায় ধাক্কা পড়লেই মা আমায় টেনে দিয়ে ছাদের এক কোণায় লুকিয়ে রেখে আসতেন। সারারাত প্রচণ্ড শীতে কাঁপতে কাঁপতে ভোর হওয়ার প্রতীক্ষা করতাম। মা-বাবা দু'জনেই নিজেদের সুবিধামত আমাকে লুকিয়ে রেখে বড় করেছেন। পুলিশকর্মীদের নজর থেকে আমাকে বাঁচিয়ে রাখাটাই যেন ওঁদের একমাত্র কাজ ছিল। যখন তখন পুলিশ চড়াও হত নিষিদ্ধপল্লিতে। বাচ্চারাও ওদের চোখে দেহব্যবসায়ী। রেড চালানোর অছিলায় নিজেদের খিদে মেটাত ওই লোকগুলো। কাউকে বাদ দিত না।' কথাগুলো বলতে বলতেই চোখ মুছলেন নাসিমা।

জীবনের এমন রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতেই নাসিমা একদিন দেওঘর বিদ্যাপীঠ থেকে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেন। চলে আসেন মজফ্‌ফরপুরে। চোখে তখন একটাই স্বপ্ন, নিষিদ্ধপল্লির মেয়েদের ফিরিয়ে আনবেন জীবনের, সামাজের মূল স্রোতে। গড়ে তুললেন নিজের সংস্থা 'পরচম'। চিকিৎসা থেকে সন্তানদের পড়াশোনা - যৌনকর্মীদের প্রতিটি প্রয়োজনে নাসিমা হাজির।

কিন্তু সরকার কতটা করেছে, বিহার সরকার? নাসিমার অভিযোগ, 'গত ৪০ বছরের রেকর্ড দেখুন। সরকার কখনও 'অপারেশন উজালা', কখনও 'অপারেশন পরিবর্তন' নাম দিয়ে যৌনকর্মীদের পুনর্বাসন প্রকল্পের কথা ঘোষণা করেছে। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। শুধুই ধোঁকা দেওয়া হয়েছে। পুনর্বাসনের নাম করে যাঁদের ধরে নিয়ে যাওয়া হয়, তাঁদের মধ্যে মাত্র ২ শতাংশ সঠিক পুনর্বাসন পান। বাকিরা আবার নতুন এক নিষিদ্ধপল্লির জন্ম দেয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, রাজধানী পাটনায় ফ্লাইং সেক্স, মোবাইল সেক্স বা ওপেন সেক্সের কারবারে জড়িয়ে পড়েন, নয়তো বিউটি পার্লারে গোপন সেক্স র‍্যাকেটের চক্রে সামিল হয়ে যান।' আক্ষেপের সুরে নাসিমা বললেন, 'নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা হতেই নিষিদ্ধপল্লিতে গতিবিধি চোখে পড়ার মতো। কিন্তু নির্বাচন শেষ হতেই ফের সেই অন্ধকারে পড়ে থাকে যৌনকর্মীরা। এঁদের নিয়ে আর কেউ মাথা ঘামায় না।'

মজফ্‌ফরপুর থেকে মাত্র তিন ঘন্টার রাস্তা সীতামারির নিষিদ্ধপল্লিতে ২০০৮ সালের ২১ এপ্রিল বাহবলীরা আক্রমন করে ও আগুন লাগিয়ে দেয়। নাসিমা জানিয়েছেন, 'ওই ঘটনার মৃতের পরিসংখ্যান রাখা হয়নি। খুবই চাতুর্যের সঙ্গে ঢেকে দেওয়া হয়েছে। কারণ এঁদের নিয়ে সরব হওয়ার কেউ নেই।'

একটি বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে সমীক্ষা করার পর, নাসিমা যে তথ্য প্রকাশ করেছেন, তাতে দেখা যাচ্ছে বিহারের ৩৮টি জেলায় ৫০টি নিষিদ্ধপল্লি রয়েছে, যার জনসংখ্যা ২ লক্ষেরও বেশি। প্রতিটি বাড়ি থেকেই সরকার কর আদায় করে থাকে। নাসিমার প্রশ্ন, তা হলে এই পল্লির মানুষরা সরকারি সুবিধা থেকে কেন বঞ্চিত? এমনই নানা প্রশ্ন নিয়ে নাসিমা ইতিমধ্যেই মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমারের সঙ্গে দেখা করেছেন। নাসিমার দৃঢ় বিশ্বাস, নীতিশ কুমার তাঁকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি রাখবেন।

'পরচম' সংস্থার অফিসে নাসিমা তাঁর স্বামী হংসরাজের সঙ্গেও পরিচয় করালেন। সাত বছর আগে পাটনার একটি ওয়ার্কশপে দু'জনের পরিচয় হয়। নাসিমার শর্ত ছিল যে, বিয়ে করতে হলে হংসরাজকে নিজের বাড়িতে খোলাখুলি সব কথা জানাতে হবে। শ্বশুরবাড়ি সমাজের বিধিনিষেধকে কোনও পরোয়া না-করেই তাঁকে সমাদরে পুত্রবধূ রূপে গ্রহণ করেছে।

নিজের অভিজ্ঞতা ও বহু ঘটনার কথা নাসিমা তুলে ধরেছেন তাঁর পত্রিকা 'জুগনু'-তে। 'জুগনু' পত্রিকাটি ইতিমধ্যেই সাড়া ফেলেছে বিহারের নিষিদ্ধপল্লিগুলিতে। এই পত্রিকায় যৌনকর্মীরাও নিজেদের কথা লিখে থাকেন। বিহারের সাংবাদিক হসনৈন হাবিব তাঁর জীবনী নিয়ে কাজ শুরু করেছেন।

- একদিন ০১.০১.১১

দু'দিন স্কুলে না এলেই বাড়িতে হাজির শিক্ষক

সীমান্ত মৈত্র - গাইঘাটা

শনিবার স্কুল ছুটির পরে ছেলেমেয়েদের আবৃত্তির ক্লাস করান প্রধান শিক্ষক।

পুজোর সময় কোনও দরিদ্র পরিবারের পড়ুয়াটির নতুন জামা না জুটলে, শিক্ষকেরা তা কিনে দেন।

সম্প্রতি কেনা হয়েছে তিনটি কম্পিউটার, যার একটি শিক্ষকেরা নিজেদের গাঁটের কড়ি খরচ করেই কিনেছেন। যা দেখে মুদি দোকানের কর্মীর তৃতীয় শ্রেণিতে পাঠরতা মেয়ে সুচন্দ্রা সরকার বলেই ফেলল, ''এই কম্পিউটার দেখলাম। আমাদের ওটা চালাতেও শেখানো হবে, ভেবেই আনন্দ হচ্ছে।''

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত-লাগোয়া বনগাঁ মহকুমার গাইঘাটার গ্রাম শশডাঙা। প্রত্যন্ত এই এলাকার মানুষের মূল পেশা দিনমজুরি। খেতজমিতে কাজ করেন কেউ কেউ। তবে, বেশিরভাগেরই 'নুন আনতে পান্তা ফুরায়' দশা। গ্রামের রাস্তা এখনও পাকা হয়নি। তবে বিদ্যুৎ এসেছে। রাস্তাতেও পড়েছিল খুঁটি। আলোর ব্যবস্থা করেছিলেন গ্রামের মানুষ। কিন্তু চোরাকারবারিদের তাতে সমস্যা হওয়ায় রাস্তার আলো তারা ভেঙে দিয়েছে। সীমান্তবর্তী আর পাঁচটা গ্রামের মতোই এখানেও বেশ কিছু মানুষ চোরাকারবারের সঙ্গে যুক্ত। রাত হলেই চলে গরু পাচার। এ সব দেখেই বড় হচ্ছে ছেলেমেয়েরা। দরিদ্র এই গ্রামে পড়াশোনা বাহুল্য ছিল বইকি! কিন্তু ইদানীং অবস্থাটা বদলাচ্ছে। সৌজন্যে, শশডাঙা এফপি বিদ্যালয় এবং তার শিক্ষকেরা। প্রধান শিক্ষক বাবুলাল সরকারের উদ্যোগে স্কুলের চেহারাটাই পাল্টে গিয়েছে। যা আখেরে গ্রামের দশাও বদলাতে পারবে বলে বিশ্বাস করতে শুরু করেছেন বুলু দাস, টুম্পা দাস, পলি সরকারদের মতো অভিভাবকেরা।

চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা হয় এই স্কুলে। তৈরি হয়েছিল ১৯৫৩ সালে। ২০০৩ সাল পর্যন্ত ইটের দেওয়াল হলেও পাকা মেঝে ছিল না। মাথায় টিনের ছাউনি। পরবর্তী সময়ে অবশ্য সরকারি টাকায় পাকা বিল্ডিং হয়েছে। কিন্তু শুধু এটুকু যথেষ্ট ছিল না ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার আগ্রহ তৈরিতে। নিরলস ভাবে সেই কাজটাই করে চলেছেন শিক্ষকেরা। বর্তমানে পুড়ুয়ার সংখ্যা ১০২ জন। কয়েক বছর আগেও সংখ্যাটা যথেষ্ট কম ছিল।

প্রত্যন্ত গ্রামে দরিদ্র পরিবারের ছেলেমেয়েদের স্কুলছুট হওয়ার প্রবণতা খুবই বেশি। কড়া নজর রেখে আগে এ দিকটাই সামলেছেন শিক্ষকেরা। ছেলেমেয়েদের কেউ হঠাৎ কয়েক দিন স্কুলে না এলেই শিক্ষকেরা দল বেঁধে চলে যান এই পড়ুয়ার বাড়িতে। কেউ পড়া ছেড়ে দিলেও তাকে ও তার পরিবারকে বুঝিয়ে ফের স্কুলমুখো করার চেষ্টা চালান শিক্ষকেরা। গ্রামে এখন স্কুলছুট নেই বলে দাবি প্রধান শিক্ষকের।

১৯৯৮ সালে এই স্কুলে এসেছিলেন বাবুলালবাবু। ২০০৬ সালে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব নেন। তিনি ছাড়াও সহশিক্ষক আছেন তিন জন। দীপঙ্কর মণ্ডল, গোপালচন্দ্র মণ্ডল এবং গৌতম কুমার রায়। সকলে মিলে টাকা দিয়ে স্কুলে বিদ্যুৎ এনেছেন। স্কুলে কবিতার ক্লাস তো আছেই, সেই সঙ্গে শারীরিক প্রশিক্ষণও দেওয়া হচ্ছে ছেলেমেয়েদের। তৈরি করা হয়েছে একটি পি টি ট্রেনিংয়ের দল। যারা বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে অনুষ্ঠান করে। দলের সদস্যদের নির্দিষ্ট পোশাক দিয়েছে স্কুল।

ক্লাস ঘরে রয়েছে বক্স বেঞ্চ। শিক্ষকেরা জানালেন, সুব্রত মণ্ডল নামে এক প্রবাসী বাঙালির অর্থানুকূল্যে এগুলি কেনা হয়েছে। স্কুলের দেওয়াল জুড়ে মনীষীদের ছবি, উক্তি। ছাত্রছাত্রীদের চরিত্র গঠন এ সবের দরকার আছে বলে মনে করেন বাবুলালবাবু। গত সোমবার থেকে শুরু হয়েছে কম্পিউটার ক্লাস। জেলায় দু'টি মাত্র এমন উদ্যোগ চোখে পড়েছে প্রাথমিক শিক্ষা দফতরের। এই স্কুলের তিনটি কম্পিউটারের ২টি কেনা হয়েছে সুব্রতবাবু এবং এলাকারই বাসিন্দা হুগলি গর্ভনমেন্ট বিএড কলেজের শিক্ষক সৌমেনপ্রসাদ মণ্ডলের টাকায়। সিলেবাস তৈরি করে দিয়েছেন সৌমেনবাবু। তিনি বলেন, ''প্রধান শিক্ষককে আমি কম্পিউটার চালু করার প্রস্তাব দিয়েছিলাম। উনি সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে যান।'' এই স্কুল থেকেই চতুর্থ শ্রেণির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে পূর্বা মণ্ডল, পিয়ালি মণ্ডল। তারা বলে, ''স্কুল ছেড়ে যেতে খুব কষ্ট হচ্ছে। আমরা কম্পিউটার শিখব বলে শিক্ষকদের অনুরোধ করেছি।'' স্থানীয় রামনগর পঞ্চায়েতের প্রাক্তন উপপ্রধান ফণিভূষণ মণ্ডল বলেন, ''সামগ্রিকভাবে গ্রামের পরিবেশের উপর ভাল প্রভাব পড়ছে স্কুলের।'' উত্তর ২৪ পরগনা জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় দপ্তরও স্কুলের উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছে। জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শক প্রদ্যুৎ সরকার বলেন, ''সরকারিভাবে স্কুলগুলিতে কম্পিউটার দেওয়ার ব্যবস্থা নেই। তবে,শশাডাঙা স্কুলের উদ্যোগ প্রশংসনীয়।''

কী বলছেন শিক্ষকেরা? তাঁদের বক্তব্য, ''সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকেই আমরা স্কুলের উন্নয়ন করছি।'' তাঁদের সেই 'দায়বদ্ধতাই' এখানকার মানুষকে নতুন রকম ভাবে বাঁচার স্বপ্ন দেখাচ্ছে।

- আনন্দবাজার পত্রিকা ২১.১.১১

পথশিশুদের কেক খাওয়াতে ভিক্ষের কড়ি দান সবিতার

নিজস্ব প্রতিবেদন : ভিক্ষাবৃত্তি করেই দিন গুজরান। দৈনিক উপার্জন তিন অঙ্ক ছোঁয়নি কোনও দিন। ব্যতিক্রম ছিল বর্ষশেষের দিনটি। আনন্দে উদ্বেল হয়ে সেই উপার্জনের অর্থ সবিতাদেবী দান করে দিলেন একটি সমাজসেবী সংগঠনকে। উদ্দেশ্য, সেই সংগঠন যেন বস্তির শিশুদের নববর্ষে কেক কিনে খাওয়ান। সকলকে তাজ্জব বানিয়ে পথচলতি মানুষের দেওয়া ভিক্ষের সমস্ত অর্থই দান করে দিলেন সবিতা সর্দার। বললেন, 'আমি ভিখারি হতে পারি। কিন্তু আমারও তো একটা মন আছে। আমার নিজের যদি ছোট ছোট নাতি-নাতনি থাকত, আমিও কেক কিনে দিতাম এমন দিনে।'

দান নিতে গিয়ে এক 'দাতা' ভিক্ষুকের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে ধনীদের উদ্দেশে গৌতমবদ্ধ বলেছিলেন, 'তোমাদের তো আছে, তাই তোমরা দিচ্ছ। ওর তো বিশেষ কিছুই নেই। যেটুকু আছে, তা-ও ওর নিঃশেষ হল এই দানে।' শুক্রবার সন্ধ্যেয় উপস্থিত থাকলে, সবিতা সর্দারকে দেখে বোধ হয় একই মন্তব্য করতেন তথাগত। বয়সে প্রৌঢ় হলেও, দারিদ্রের বোঝায় প্রৌঢ়ত্ব আড়ালে চলে গিয়েছে। না-খেতে পাওয়া শুকনো মুখ দেখে ষাটোর্ধ্বই মনে হয়। জঠরজ্বালা জুড়োতে, তিন কুলে কেউ না-থাকা এই প্রৌঢ়া উত্তর ২৪ পরগনা থেকে উত্তর কলকাতায় ডেলি-প্যাসেঞ্জারি করেন।

প্রতিদিনের মতো ওই দিনও মহানগরের উত্তর প্রান্তের মোড়ে মোড়ে সবিতাদেবী ঘুরেছেন ভিক্ষাপাত্র হাতে। 'নিউ ইয়ার্স ইভ'-এ আনন্দ করতে বেরোনো শহরবাসীর খুশির সৌজন্যেই সবিতার প্রায় ১০০ টাকা উপার্জন হয় বছরের শেষ দিনে। দিনের শেষে ঠিক করে ফেলেন, কী করবেন সেই টাকায়। শোভাবাজার হাটখোলার মেডিক্যাল ব্যাংকে সেই টাকাই তিনি দান করে দেন। সংস্থাটি বস্তি ও ফুটপাতের গরিবগুর্বো মানুষদের নিয়ে দীর্ঘ দিন কাজ করে আসছে। ওষুধ, বস্ত্র ইত্যাদি দান করা ছাড়াও নিয়মিত এঁরা এই মানুষগুলোর চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন নিখরচায়। ফলে উত্তর কলকাতার বস্তি বা ফুটপাথবাসী থেকে শুরু করে ভিক্ষুক, সকলেই পরিচিত মেডিক্যাল ব্যাংকের সঙ্গে।

সংগঠনের সম্পাদন ডি আশিস বললেন, 'সবিতাদেবী আমাদের জানেন। আমরাও চিনি। এর আগে আমাদের থেকে উনি ওষুধ নিয়ে গিয়েছিলেন। ৩১ তারিখে উনি এসে ১০০ টাকা দিয়ে আমাদের বললেন, বস্তি আর ফুটপাথের গরিব বাচচাদের কেক কিনে দিতে।' হতবাক আশিস জানালেন, সবিতাদেবীর দানের অঙ্কটা বড় নয়। কিন্তু মানসিকতাটাই আসল। 'এমন বিরাট মনের মানুষ যে আজও আছেন, তা দেখলে বিস্ময় জাগে,' জানিয়েছেন মুগ্ধ আশিসবাবু।

- একদিন ০২.০১.১১

ওখানে শিশুরা কেমন আছে

যে শিশু বেড়ে উঠছে গোলা-গুলি-বোমার শব্দের মধ্যে, যে শিশু দিনরাত শুধু শুনছে কান্না, পুলিশের ভারি বুটের আওয়াজ, দেখছে রক্তাক্ত লাশ-তার মনে দেখা দেবে কীভাবে মানবিকতা, ন্যায়-অন্যায় বোধ ? আলোচনা করেছেন মিতা সরকার চক্রবর্তী।

সময়টা ১৯৯৮-৯৯ সাল। জঙ্গলমহল সংলগ্ন বেশ কিছু মানুষের বিশ্বাস বাঁকুড়া, গড়বেতা অঞ্চলে সিপিএমের স্থানীয় এক নেতা এবং বেলপাহাড়ি বা বিনপুর ২ নং ব্লকে অপর আরেক একই দলের নেতা এখানকার মাওবাদী বলে যাঁরা চিহ্নিত তাঁদের পূর্বতন দুটি গোষ্ঠীকে উল্লিখিত অঞ্চলগুলিতে সাদরে আশ্রয় দিয়েছিলেন। মনে করা হয়, তৃণমূল কংগ্রেসকে ঠেকানোর জন্য সিপিএম নেতারা ওই কাজের দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন। মোটামুটিভাবে তখন থেকেই প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে জঙ্গলমহলের শিশুরা দু'চোখ মেলে দেখে চলেছে হানাহানি, হিংসা, প্রতিহিংসা আর মৃত্যুর মিছিল। তখন থেকেই কয়েকটি শব্দ তাদের কচি কোমল অবুঝ মনে তিরের ফলার মতো বিঁধে চলেছে। যেমন সন্ত্রাস, খুন, গুলি, বন্দুক, সিপিএম, তৃণমূল আর মাওবাদী ইত্যাদি। এইসব শব্দ বা কথাগুলির সঙ্গে একটা গাঢ় ভয় জমাট বেঁধে থাকে ওই অঞ্চলের শিশুদের মনে। খুব জোরের সঙ্গে বলতেই হয়, কেউ কি কোনোদিনও 'এটা করতেই হবে বা করা উচিত' হিসেবে শিশুদের মনে কান পেতেছে ?

অনুন্নয়ন, যুগ-যুগান্তরের বঞ্চনা, লাঞ্ছনা, শোষণ ও অবহেলাতাড়িত গরিব-গুর্বো মানুষদের বেঁচে থাকাটাই যেখানে মস্ত দায়, সেখানে শিশুর যথাযথ, প্রয়োজনীয় একান্তই আবশ্যিক এবং ন্যূনতম চাওয়া-পাওয়ার কথার বা হিসেব করার অবকাশ কোথায় ? প্রতিদিন পশ্চিম মেদিনীপুরের এ-গ্রাম ও গ্রামের শিশুরা ঘুম থেকে উঠেই শুনতে পায় গোলাগুলির, কান্নার, পুলিশের ভারী বুটের আওয়াজ। ঘুমোতে যাওয়ার সময়ও এইসব অসহ্য ভয়ার্ত আওয়াজ শিশুদের মনে গভীরভাবে রেখাপাত করে। যে মাঠে ওরা ছুটে বেড়াবে, খেলা করবে, সেই মাঠে যখন কোনও শিশু দেখবে রক্তস্নাত, বুলেটবিদ্ধ এক বা একাধিক দেহ পড়ে আছে, তখন সেই শিশুর মনে কত যে প্রশ্ন তোলপাড় করবে, কে দেবে তার মনের আনাচে কানাচে লুকনো নানা প্রশ্নের উত্তর ? অধিকাংশ বড়োরাই ভাবেন যে, 'ওরা তো ছোটো, ওরা বিশেষ কিছু বোঝেনা।' এমন ধারণা নিতান্তই অর্বাচীনসুলভ। বরং বলা যায়, শিশুরা এতটাই সংবেদনশীল যে বড়োরা তাদের সেই সংবেদনশীল মানসিকতার নাগাল পেতে অপারগ।

সকাল সন্ধে যে শিশুরা হত্যা, বন্দুক, গুলি, বোমা, পুলিশ, আপনজন অথবা অন্য কোনও মৃতদেহ ইত্যাদি কথা বা ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে দিয়ে দিনযাপন করে পরবর্তীকালে সেই শিশুদের কাছ থেকে মানবিকতা, ন্যায়-অন্যায় বোধ, সুস্থ মানসিকতা ইত্যাদি আশা করা যায় না। একেই তারা তাদের মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত। তার উপর প্রতিনিয়ত সামাজিক অস্থিরতা। এই দুইয়ের মধ্যে দিয়ে যে শিশু বেড়ে ওঠে তার মনে যে অবচেতনেই অন্যায়, অর্থনৈতিক, অপরাধ প্রবণতার বাসা বাঁধার প্রক্রিয়া সক্রিয় থাকবে, একথা বলা বাহুল্য। সমাজতাত্ত্বিক এবং মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তারবাবুরা এমন অভিমতই প্রকাশ করেছেন।

জঙ্গলমহলে বছরের পর বছর বিভিন্ন স্কুলে পুলিশের থাকার ব্যবস্থার কথা অজানা নয়। যে স্কুলগুলিতে পুলিশ বসবাস করছে সেখানে পঠনপাঠন বন্ধ। এতে সরকারের কী আসে যায়। ওই স্কুলগুলিতে যে শিশুরা পড়াশোনা করত তাদের কিন্তু এ এক মস্ত ক্ষতির বিষয়। শিশুদের পড়াশোনার ভিতরটা সরকারি আনুকুল্যেই বড়ো নড়বড়ে। একে তো বহির্মূল্যায়ন নামে একটা প্রহসন ক্রমাগত শিশুদের পঙ্গু করে দিচ্ছে। দ্বিতীয় এবং চতুর্থ শ্রেণিতে বহির্মূল্যায়নের কাজটা হয়ে থাকে। যেমন ধরা যাক 'ক' স্কুলের শিক্ষকরা 'গ' স্কুলে গিয়ে দ্বিতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রদের মান নির্ণয়ের জন্য বেশ কিছু প্রশ্ন করেন। দেখা গেছে, অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রী যথাযথ উত্তর দিতে অক্ষম। তখন শিক্ষকদের অস্তিত্বের সংকট দেখা দেয়। ফলে দল, মতের উর্ধ্বে উঠে বহির্মূল্যায়ন করতে আসা শিক্ষকরা ছাত্রদের উত্তর বলে দেন। কার্যত যা হয় তা হল ছাত্র-ছাত্রীরা না পড়ে বা না জেনেশুনেই মূল্যায়নের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে যায়। মূল্যায়নটা শেষে শিক্ষকদের হয়। এতে ছাত্র-ছাত্রীদের যে ক্ষতি হয় তা অপূরণীয়। একথা ঠিক যে, খাতায়-কলমে প্রায় ৯৯ শতাংশ শিশুর নাম স্কুলের খাতায় লেখা থাকে। কিন্তু হাজিরার চিত্রটা অন্য কথা বলে। কারন শিক্ষকদের অযোগ্যতা, পড়ানোর ক্ষেত্রে অনীহা, ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি ভালোবাসার অভাব, ছাত্র-ছাত্রীদের স্কুল-বিমুখ করে তোলে। এমনকী মিড-ডে-মিলের ব্যবস্থাও তাদের স্কুলে আসার ক্ষেত্রে কার্যকর হয় না।

শিশুদের পড়ানোর প্রক্রিয়াটা বড়ো কঠিন। এর জন্য আলাদা করে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু গ্রাম থেকে প্রত্যন্ত গ্রামের শিক্ষককুল এই বিষয়ে বেমালুম অসতর্ক। জঙ্গলমহলে তো এখন পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে যেন আলাদা একটি ভূখণ্ড। খুন, জখম, সংঘর্ষ ইত্যাদির যে-কোনও ছবি যখন টিভির পর্দায় দেখানো হয়, লক্ষ্য করলে দেখা যাবে এই ভীষণ শীতেও শিশুরা আদুর গায়ে দাঁড়িয়ে। তাঁদের সর্বাঙ্গে লেপটে রয়েছে দারিদ্রের বেআব্রু ভাব।

নেতাই গ্রামের কলঙ্কিত ঘটনার পর কার্যত আমরা একটা মস্ত বড়ো প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছি। প্রশ্নটা হল, আমরা কি পশুবৃত্তির কার্যকারণ হয়ে পড়ছি না ? কোনও সভ্য সমাজে এমন অনায়াস, গণহত্যালীলা, নারীহত্যা হয়, না হওয়া উচিত ? এই ভয়ানক ভয়াবহ আবর্তে শিশুরা কেমন আছে, সেই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার একটা দায় আমাদের রয়েছে। শিশুদের কথা ভাবছেন না ? প্রশ্নটা কিন্তু নিতান্তই প্রাসঙ্গিক।

কথায় বলা হয়, শিশুরাই জাতির ভবিষ্যৎ। বাস্তবে কিন্তু কথাটি একটি প্রহসনের নামান্তর। অন্তত জঙ্গলমহলের শিশুদের ক্ষেত্রে একথাকে অস্বীকার করার উপায় নেই। কিশোর কবি সুকান্ত বলে গিয়েছিলেন, 'চলে যাব - তবু আজ যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ / প্রাণপণে পৃথিবীর সরাবো জঞ্জাল, / এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি...।' তাঁর ভাতুষ্পুত্র কিছু না বলে যা করছেন, তা এইরকম এ শিশুকে তিনি কোন বিশ্বের বাসযোগ্য করে যাবেন। জঙ্গলমহলের শিশুদের দেখে এ কথাই তো মনে হয়।

- সকালবেলা ০১.০২.১১

লেখিকা সমাজকর্মী ও সাহিত্যসেবী

সেদিনের চোয়াড় আর আজকের মাওবাদী তকমায় আমরা রইলাম ইতিহাসের অন্ধকারেই

আমি বাংলায় কথা বললেও বাঙালি নই, আমি ঝাড়খণ্ড সীমান্তে বাস করলেও ঝাড়খণ্ডী নই, আমি না ব্রাহ্মণ, না ক্ষত্রিয়, আমি মানুষ - আমি মানভূমের মানুষ। আমি পশ্চিমবঙ্গের কোণায় বাস করি। আমার বেঁচে থাকতে ঝাড়খণ্ডের হাওয়া লাগে, ওড়িশার খনিজ দরকার। আমার মাতৃভাষা সরকারি স্বীকৃত নয় - ওরা বলে 'ডায়ালেক্ট', মানে অপভ্রংশিত ভাষা। আমাদের সংস্কৃতির অন্য এক নাম আছে - লোকসংস্কৃতি। বলতে পারেন ছোট লোকদের সংস্কৃতি। রবীন্দ্রনাথ কিছু লিখলে তা বোধহয় এই লোকসংস্কৃতির আওতায় পড়বে না। কিন্তু আমাদের এই পুরুলিয়ার কুড়মালি ভাষা দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে মাইকেল মধুসূদন দত্ত 'অমিত্রাক্ষর ছন্দ' প্রবর্তন করেন। কিন্তু ক্ষমতা তো শহুরে 'মূলস্রোত'-এর মানুষের হাতে। তাঁরা ইতিহাসে সত্য ঘটনা লিখতে দেন না, ইতিহাস রচনা করেন আপন স্বার্থে। সে ইতিহাস বলে আমরা জঙ্গলের মানুষ। ইতিহাস বলছে বলে নয়, ব্যাপারটা আসলে চরম সত্য। আমাদের জঙ্গলমহল নামে এক জেলাও ছিল ইংরেজ আমলের আগে। আমরাই প্রথম ইংরেজদের শাসন মানতে রাজী হইনি। আমাদের পূর্বপুরুষরাই প্রথম বিদ্রোহ করেন এই ওই বিদেশি শাসকদের বিরুদ্ধে।

এই জঙ্গলমহলের মানুষগুলোই কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য 'বাবু' অঞ্চলের মানুষদের মত এত সহজে হার স্বীকার করে নেয়নি। তাই বোধহয় ইংরেজরা তাদের 'চোয়াড' বলে ডাকত। সত্যি! যারা ইংরেজদের কথা এক বাক্যে মেনে নিল, তারা হল 'সভ্য', আর যারা তা মানল না, তারাই হল 'চোয়াড'। কিন্তু ইংরেজদের দেওয়া সে নাম কেন মেনে নিল ভারতীয়রা ?

১৭৬০ সালে মীরকাশিমের কাছ থেকে ইংরেজদের ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি জমি লাভ করলেও মেদিনীপুর জেলার উত্তর-পশ্চিমাংশের ১০০ ক্রোশ লম্বা কৃষক অধ্যুষিত 'জঙ্গলমহল' অঞ্চলের প্রজাদের উপর ক্ষমতা বিস্তার বা তাদের কাছ থেকে কর আদায় করা সহজ ছিল না। জেলার পশ্চিমভাগ ঝাড়গ্রাম, রামগড়, লালগড়, শিলদা, জামনি প্রভৃতি স্থানে বহুকাল স্বাধীনভাবে রাজত্ব চালানো রাজা ও জমিদারদের বেশিরভাগ অংশটাই ছিল লোধা, মাঝি, কুড়মি, বাগদি, কোরা, মুন্ডারি ও মজুর সম্প্রদায়ের মানুষ। জীবিকার জন্য এরা স্থানীয় জমিদারদের অধীন পাইক বা সৈন্যের কাজ করত। এরা বেতনের পরিবর্তে জমি-জায়গা পেত। ১৭৬৫ সালে ইংরেজ কোম্পানি রাজস্ব দ্বিগুণ করলে জমিদারেরা মহাজনের কাছে চড়া সুদে ধার নিয়ে ধার মিটিয়ে প্রায় নিরন্ন ভিখারি অবস্থায় পৌঁছে যায়। ভোগ করা সেই নির্যাতন বিদ্রোহের আগুন হয়ে জ্বলে ওঠে। ১৭৬৭ সালে দু'শো ক্রোশ ব্যাপী জঙ্গলমহলে তীর, টাঙ্গি, বর্শা, বাটুল নিয়ে বিদ্রোহ চলে। এটাই ভরতের ইতিহাসে স্বাধীনতার প্রথম যুদ্ধ। কিন্তু ইতিহাস সেই যুদ্ধকে মর্যাদা দেয়নি। এর নাম দিয়েছে 'চোয়াড বিদ্রোহ'। চোয়াড কথাটার অর্থ অসভ্য, বর্বর, জংলি। অথচ এই জঙ্গলমহলের মানুষগুলোই কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য 'বাবু' অঞ্চলের মানুষদের মত এত সহজে হার স্বীকার করে নেয়নি। তাই বোধ হয় ইংরেজরা তাদের 'চোয়াড' বলে ডাকত। সত্যি! যারা ইংরেজদের কথা এক বাক্যে মেনে নিল, তারা হল 'সভ্য', আর যারা তা মানল না, তারাই হল 'চোয়াড'। কিন্তু ইংরেজদের দেওয়া সে নাম কেন মেনে নিল ভারতীয়রা ? যেখানে বিদেশি শাসন না মানাটাই গৌরবের কাজ, সেখানে ভারতের ইতিহাসে এর উপস্থাপন এতটা খারাপ ভাবে কেন ? ভারতের ইতিহাসে তো ভারতীয়দেরই লেখা। তা হলে ইতিহাসে স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করা মানুষগুলোকে 'চোয়াড' বলে ডাকতে একবারও ভাবল না কেন ? কেনই বা এই আন্দোলন ভারতের ইতিহাসে স্থান পেলনা প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম হিসাবে ? কারণ বোধ হয় এই বিদ্রোহ পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, মেদিনীপুরের মানুষের সংগ্রাম ছিল। ইতিহাস কথিত সিপাহি বিদ্রোহ দেশের কয়েকটি অঞ্চলে সীমাবদ্ধ ছিল, তবুও তা হয়ে গেল ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ।

প্রশ্ন, জঙ্গলমহল কি ভারতের বাইরে ?

আজও তো বৃটিশের আখ্যা দেওয়া 'চোয়াড'গুলো বেঁচে আছে জঙ্গলমহলে। তবে এমন তাদের নতুন নাম হয়েছে 'মাওবাদী'। স্বাধীনতার পর ষাট বছর ধরে ভারতের সভ্য মানুষদের চালানো (শাসনযন্ত্র) তাদের কাছে অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা বা স্বাস্থ্যের ন্যূনতম সুযোগটুকু পৌঁছে দিতে পারেনি। আসলে, ভারতের ইতিহাসটাও শয়তানির শেষ আশ্রয় রাজনীতিতে ঢাকা, সে আর নতুন করে বলার কিছু নেই। যে কারনে বলিউডি-টলিউডি উলঙ্গ নৃত্য সভ্যতার উত্তুঙ্গ শিখর, আর আমাদের উলঙ্গ থাকা পূর্বপুরুষরা 'অসভ্য', 'বর্বর'।

বস্তুত, এই ইতিহাস তদানীন্তন কিছু সংবাদপত্র ও লিখিত কিছু বই দেখেই রচনা করা। যার পরবর্তীতে কোনও সংশোধনের চেষ্টা হয়নি। সে ট্র্যাডিশন তো আজও চলছে। বিদেশি রাষ্ট্রের রোষে সেদিন মরেছিল 'চোয়াড', আজ দেশি শাসকদের হাতে মরছে 'মাওবাদী'।

■ **দিলীপকুমার মাহাতো**, বান্দোয়ান, পুরুলিয়া

(**একদিন**, জুলাই ৭, ২০১০)

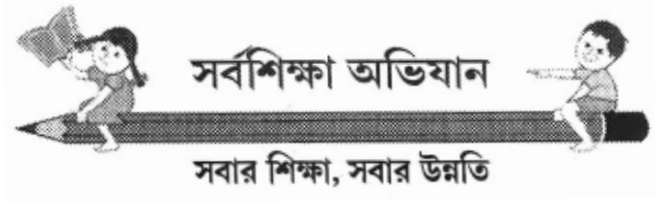

সর্বশিক্ষা অভিযান

সবার শিক্ষা, সবার উন্নতি

পশ্চিমবঙ্গ সর্বশিক্ষা মিশন

জনস্বার্থে প্রচারিত বিজ্ঞপ্তি

বিনাব্যয়ে বাধ্যতামূলক শিশুর শিক্ষার অধিকার আইন ২০০৯, ১ এপ্রিল ২০১০ থেকে কার্যকর হয়েছে। এই আইন মোতাবেক আমাদের দেশে ৬-১৪ বছর বয়সের সমস্ত শিশুর বিনামূল্যে এবং বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার অনুকূল এবং উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এই আইনের ৩৫(২) ধারা অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্কুল শিক্ষা দপ্তরকে প্রদত্ত ক্ষমতা বিভিন্ন প্রজ্ঞাপন মারফৎ ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়েছে। যা স্কুল শিক্ষা দপ্তরের ওয়েবসাইট www.wbsed.gov.in থেকে উপলব্ধ করা যাবে। এই প্রজ্ঞাপনগুলির মূল অনুবিধি সমূহ নিম্নরূপ:

ক স্কুল কর্তৃপক্ষ ভর্তির প্রক্রিয়া চলাকালীন কোন ব্যক্তি বিশেষের কাছ থেকে কোনও ধরনের অর্থ সংগ্রহ (ক্যাপিটেশন ফি) করতে পারবেন না অথবা বাছাই (স্ক্রিনিং) পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারবেন না। স্কুল শিক্ষা দপ্তরের নোটিফিকেশন নং ৮৬-এস.এস.ই/১১/ই.এস/এস/১এ-০১/২০০৯ তারিখ ঃ ২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১১

উক্ত আইনের ১৩ ধারায় বলা আছে যে কোনও স্কুল কর্তৃপক্ষ ভর্তির প্রক্রিয়া চলাকালীন যে কোনও ধরনের ক্যাপিটেশন ফি নিতে পারবেন না এবং এই আইন লঙ্ঘন করলে সংগৃহীত অর্থের দশগুণ পরিমাণ জরিমানা যা সর্বাধিক ২৫,০০০ টাকা প্রথমবারের জন্য এবং পরবর্তীকালে লঙ্ঘন করলে ৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত ধার্য করা হতে পারে। আর টি ই আইন-এর ১৩ ধারাতে ভর্তির প্রক্রিয়া চলাকালীন স্কুল কর্তৃপক্ষকে কোনও রকম বাছাই করা থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। স্কুলের নির্দিষ্ট আসন সংখ্যা অপেক্ষা ভর্তির জন্য আবেদনকারীর সংখ্যা যদি বেশি হয় তবে লটারির মাধ্যমে শিশুদের ভর্তি করতে হবে।

যে কোনওভাবে এই ধারা লঙ্ঘিত হলে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট জেলা স্কুল পরিদর্শক অথবা জেলাশাসকের কাছে অভিযোগ দায়ের করতে পারেন এবং কলকাতায় অবস্থিত স্কুলের ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি কলকাতা পৌরসংস্থার কমিশনারের নিকট অভিযোগ দায়ের করতে পারেন। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ অভিযোগ দায়ের করার ৬০ দিনের মধ্যে বিষয়টি তদন্ত করে দেখবেন এবং তদন্তসূত্রে পাওয়া তথ্যাদি সুপারিশসহ স্কুল শিক্ষা অধিকর্তার নিকট পাঠাবেন। অধিকর্তা, স্কুল শিক্ষা দপ্তর অভিযুক্ত স্কুল কর্তৃপক্ষকে নিজেদের বক্তব্য পেশ করার সুযোগ দেওয়ার উদ্দেশ্যে শুনানির আবেদন মঞ্জুর করবেন এবং তারপর স্কুলকর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদেয় জরিমানার পরিমাণ নির্দ্ধারণ করবেন। স্কুল শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তার আদেশের বিরুদ্ধে ৩০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সচিবের নিকট আবেদন করতে পারেন যিনি ৩০ দিনের মধ্যে দেয় আবেদন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত জানাবেন।

খ শিক্ষকগণ কর্তৃক প্রাইভেট টিউশন বা প্রাইভেট পড়ানোর কার্যকলাপের ওপর প্রদত্ত নিষেধাজ্ঞা : নোটিফিকেশন নং ১৮৯-এস ই (ল)/এস/১এ-০১/০৯ তারিখ ঃ ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১১

আর টি ই আইন-এর ২৮ ধারা মোতাবেক শিক্ষকদের প্রাইভেট টিউশন বা প্রাইভেট পড়ানো সংক্রান্ত কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকতে বলছে। স্কুলের কোনও শিক্ষক যাতে প্রাইভেট টিউশন বা প্রাইভেট পড়ানো সংক্রান্ত কোনও রকম কার্যকলাপে নিজেদের নিয়োজিত না করেন, এ বিষয়টি সুনিশ্চিত করা প্রত্যেক স্কুল কর্তৃপক্ষের আশু কর্তব্য। এই ধরণের কার্যকলাপে কোনও শিক্ষক জড়িত থাকলে স্কুল কর্তৃপক্ষ তাঁর বিরুদ্ধে যথাযথ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

গ কোন রকম বেতন, মূল্যাদি বা ব্যয় যা একজন শিশুকে প্রাথমিক শিক্ষাগ্রহণ বা সম্পূর্ণকরণ থেকে নিবৃত্ত করতে পারে সেই সম্পর্কিত নিষেধাজ্ঞাকরণ ঃ নোটিফিকেশন নং ১৮৭-এস ই (ল)/এস/১এ-০১/০৯ তারিখ ঃ ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১১

আর টি ই আইন-এর ৩ (২) ধারা মোতাবেক কোনও সরকারি স্কুল প্রারম্ভিক (৮ম শ্রেণি পর্যন্ত) পর্যায়ে কোনও শিশুর কাছ থেকে যে কোনও ধরণের বেতন, মূল্যাদি বা ব্যয় সংগ্রহ করতে পারবেন না। স্বীকৃত সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুল/রাজ্য সরকার বা যে কোনও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে সাহায্য বা অনুদানপ্রাপ্ত স্কুল প্রারম্ভিক স্তরে একটি শিশুর জন্য সর্বাধিক বছরে ২৪০ টাকা উন্নয়ন ব্যয় হিসাবে নিতে পারবে। যদি কোনও অভিভাবক এই মর্মে স্কুল কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করেন যে, আর্থিক দুর্বলতা হেতু এই উন্নয়ন মূল্য আদায়ের ফলে তাঁর শিশুর প্রারম্ভিক শিক্ষাগ্রহণ সম্পূর্ণ করা সম্ভব হবে না এবং এ ব্যাপারে ছাড় পাওয়ার জন্য আবেদন করলে যথাযথ অনুসন্ধান করে স্কুল কর্তৃপক্ষ ৩০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট আবেদন বিবেচনা করবেন। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্কুল কর্তৃপক্ষ তাঁদের সিদ্ধান্ত জানানোর ১৫ দিনের মধ্যে এই অভিভাবক সংশ্লিষ্ট জেলা স্কুল পরিদর্শক বা তাঁর মনোনীত নির্দিষ্ট আধিকারিকের নিকট আবেদন করবেন যিনি উভয়পক্ষের বক্তব্য শোনার পর ৩০ দিনের মধ্যে বিষয়টির মীমাংসা করবেন। এ বিষয়ে জেলা স্কুল পরিদর্শকের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত এবং অবশ্য পালনীয়।

ঘ সাহায্যপ্রাপ্ত নয় এমন স্কুলগুলি আর্থিকভাবে দুর্বলতর শ্রেণি এবং অনগ্রসর শ্রেণিভুক্ত শিশুদের ১ম শ্রেণিতে মোট আসনের ২৫% পর্যন্ত ভর্তি করবে ঃ নোটিফিকেশন নং ১৯০-এস ই (ল)/এস/১এ-০১/০৯-১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১১

আর টি ই আইন ২০০৯-এর ১২(১) (সি) ধারা অনুযায়ী অনুদানহীন স্কুলগুলি ১ম শ্রেণির মোট আসন সংখ্যার কমপক্ষে পঁচিশ শতাংশ পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট এলাকার আর্থিকভাবে দুর্বলতর শ্রেণি (বি.পি.এল) এবং অনগ্রসর গোষ্ঠীভুক্ত (তপঃ জাতি/তপঃ উপজাতি/ও.বি.সি) ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিনামূল্যে এবং বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করবে, যার মধ্যে সহশিক্ষাভুক্ত স্কুলগুলিতে ৫০% আসন ছাত্রীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। পশ্চিমবঙ্গে আর্থিকভাবে দুর্বলতর শ্রেণিভুক্ত শিশু হল সেই-ই যার পিতামাতা যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত তালিকা অনুযায়ী দারিদ্র সীমার নিচে (বি.পি.এল) অবস্থান করেন। প্রতিটি অনুদানহীন স্কুল প্রতি বছর তাদের ১ম শ্রেণির ভর্তির বিজ্ঞপ্তিতে এই ধরণের আসনের কথা অবশ্যই বিজ্ঞাপিত করবে এবং এই ধরণের ভর্তির বিস্তারিত তথ্য প্রতিবছর জেলা স্কুল পরিদর্শকের কাছে পাঠাবেন। এই ধরণের ভর্তির আবেদন করার সময় পিতামাতা/অভিভাবকগণ তাঁদের প্রাসঙ্গিক আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইস্যু করা সংশাপত্র জমা দেবেন।

নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে আর্থিকভাবে দুর্বলতর শ্রেণি এবং অনগ্রসর গোষ্ঠীভুক্ত শিশুদের মধ্যে আসন বন্টন করতে হবেঃ

ক্রম নং	শ্রেণি	অনুপাত
(ক)	তফশিলি জাতিভুক্ত শিশু	২২
(খ)	তফশিলি উপজাতিভুক্ত শিশু	০৬
(গ)	অন্যান্য পিছিয়ে পড়া (ক) শ্রেণিভুক্ত শিশু	১০
(ঘ)	অন্যান্য পিছিয়ে পড়া (খ) শ্রেণিভুক্ত শিশু	০৭
(ঙ)	সমাজের দুর্বলতর অংশভুক্ত শিশু	৫৫

অনুপাতভিত্তিক আসনের চেয়ে বেশিসংখ্যক দরখাস্ত গৃহিত হলে বি পি এল, তঃ জাঃ/তঃ উঃ জাঃ /ও বি সি শিশুদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। যে কোনও শ্রেণিতে প্রাপ্ত আসনের চেয়ে কম সংখ্যক দরখাস্ত গৃহিত হলে, অন্যান্য শ্রেণির আবেদনকারীদের মধ্যে থেকে তা পূরণ করতে হবে। একবার ভর্তি হলে এটা স্কুল কর্তৃপক্ষের দেখা একান্ত কর্তব্য যে, দুর্বলতর অংশ এবং অনগ্রসর গোষ্ঠীভুক্ত ভর্তি হওয়া শিশুদের যেন কোনও অবস্থাতেই বৈষম্য বা পৃথক করে না দেখা হয়। আর টি ই অ্যাক্টের অধীনে নির্ধারিত নিয়মাবলি অনুযায়ী শিশুদের পড়াশোনার সরঞ্জাম এবং ইউনিফর্ম বাবদ স্কুল কর্তৃপক্ষের ব্যয় করা সমস্ত অর্থ সরকার পরিশোধ করবে।

স্বা/-
রাজ্য প্রকল্প অধিকর্তা
পঃ বঃ সর্বশিক্ষা মিশন

বর্তমান, ০১.০৩.২০১১

পরীক্ষায় ডাহা ফেল।
পশ্চিমবঙ্গের ধসে পড়া শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে প্রতিশ্রুতির সান্তনা আর কতদিন?

সুবর্ণ বসু

সারা ভারতে প্রায় ১৩ লক্ষ স্কুলে বার্ষিক সমীক্ষা (২০০৯-১০) সমাপ্ত করে মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক সম্প্রতি যে-ফলাফল প্রকাশ করেছে, তাতে বুনিয়াদি শিক্ষার ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান পরিস্থিতি বেশ লজ্জাজনক। দেশের ২৮টি রাজ্য এবং সাতটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মোট ৬৩৫টি জেলায় প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণি, অর্থাৎ প্রাথমিক থেকে উচ্চ প্রাথমিক স্তরে সমীক্ষা করা হয়েছে। রিপোর্ট থেকে পরিষ্কার, অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় এই স্তরে শিক্ষার প্রসারে পশ্চিমবঙ্গ সরকার সার্বিকভাবে ব্যর্থ। আয়তনে বড় যে-২১টি রাজ্যের তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে, সেখানে উচ্চ প্রাথমিক স্তরের রাজ্যগুলোর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের স্থান একেবারে শেষের দিকে। শিক্ষার্থী অনুপাতে শ্রেণিকক্ষ, পরিস্রুত জল, ছাত্রীদের জন্য আলাদা শৌচাগার—এই প্রতিটি সূচকে প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিক স্কুলগুলোর ক্ষেত্রে রাজ্যের স্থান যথাক্রমে ১৩ ও ১০। দু'টি ক্ষেত্রেই পাঞ্জাব প্রথম। শিক্ষার্থী অনুপাতে শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা এবং শিক্ষকদের যোগ্যতার ক্ষেত্রে প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিক স্তরে পশ্চিমবঙ্গের স্থান উভয়ক্ষেত্রেই ১৪। এই দু'টি ক্ষেত্রেই বামশাসিত কেরল প্রথম। স্কুলছুট, প্রাথমিক থেকে উচ্চ প্রাথমিকে ভর্তি না-হওয়া পড়ুয়া, তফশিলি জাতি-উপজাতির জনসংখ্যা ও তাদের স্কুলে পড়ার অনুপাত-এর ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক স্তর ১৫ এবং উচ্চ প্রাথমিক স্তরে ১৮ নম্বর স্থানে, দু'টি ক্ষেত্রেই প্রথম তামিলনাড়ু। এ বাদেও যে-পরিসংখ্যান আছে রিপোর্টে, তা থেকে এটুকু পরিষ্কার যে, পরিকল্পনা, পরিকাঠামো এবং প্রয়োগ, বুনিয়াদি শিক্ষা প্রসারের তিনটি ক্ষেত্রেই ডাহা ফেল করেছে পশ্চিমবঙ্গ। যথারীতি অত্যন্ত নির্বিকার ভঙ্গিতে গত ৩৪ বছরেও রাজ্যে শিক্ষার আশানুরূপ উন্নতি করতে না-পারার দায় এড়াচ্ছেন বাম সরকার!

শিক্ষার পরিকাঠামো বিস্তারে বা পদ্ধতির মানোন্নয়নে আমাদের রাজ্য যে ক্রমশই পিছিয়ে পড়ছে, তা এ বছরের সমীক্ষা থেকেই প্রথম উঠে এল না। শুধু প্রাথমিক বা উচ্চ প্রাথমিক কেন, শিক্ষার কোনও স্তরই এ রাজ্যে আর সমস্যামুক্ত এবং স্বচ্ছ নয়। নিজস্ব ক্যাডারদের 'পাইয়ে দেওয়ার রাজনীতি' এবং মধ্যমেধার পোষণের মাধ্যমে ভোটব্যাঙ্ক সুনিশ্চিত করাই এখন শাসকদলের এক ও একমাত্র লক্ষ্য। রাজ্যের অন্যতম দুর্নীতিগ্রস্ত ক্ষেত্রগুলোর মধ্যে ক্রমেই জায়গা পাকা করে নিচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাক্ষেত্র। ধামাধরাদের প্রতি একচোখোমি যে আমাদের রাজ্যে শিক্ষার সকল স্তরেই সাড়ে-সর্বনাশ করে ছেড়েছে, তা নিয়ে আর নতুন করে বলার কিছু নেই। মানবসম্পদ উন্নয়নের এই রিপোর্টের পরিপ্রেক্ষিতে সরকারপক্ষ থেকে সাফাই দেওয়া হয়েছে, প্রাথমিক এবং উচ্চ প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে রাজ্যের অগ্রগতি একেবারে যথাযথ, বরং মানবসম্পদ উন্নয়নমন্ত্রকের সমীক্ষাপদ্ধতিটিই মানদণ্ড হিসাবে মনোত্তীর্ণ নয়!

পশ্চিমবঙ্গে শাসকদলের শিক্ষক সংগঠনের নেতারা যেসব স্কুলে আছেন, সেখানে শিক্ষকের অভাব নেই, ২০ জন ছাত্রছাত্রীদের জন্যও আছেন জনাচারেক শিক্ষক। পাশাপাশি শাসকদলের কৃপাবঞ্চিত এমন স্কুলও বিরল নয়, যেখানে ৩৫০ জন শিক্ষার্থীর জন্যও শিক্ষক আছেন সেই জনাপাঁচেক। বুনিয়াদি স্তরের শিক্ষকরা স্বাভাবিকভাবেই ক্ষুব্ধ। প্রতি হাজার জনসংখ্যার জন্য যখন প্রতিটি উচ্চ প্রাথমিক স্কুলপিছু প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা হওয়া উচিত দু'টি, সেখানে বাস্তবে সেই সংখ্যা পাঁচেরও বেশি। এর ফলে উচ্চ-প্রাথমিক স্কুলে শিক্ষার্থীর সংখ্যা আনুপাতিক হারে বেশি। এই অনুপাতকাঠামো প্রাথমিক শিক্ষার অস্বাস্থ্যকর বন্টনের পরিচায়ক। প্রাথমিক বরং উচ্চ প্রাথমিক স্তরের আরও গুরুত্বপূর্ণ একটি সমস্যা, শিক্ষার্থীপিছু শিক্ষকের সমস্যা। অভিভাবক এবং শিক্ষক সম্প্রদায়ের সাধারণ অভিযোগ, ৫০-৬০ বা তারও কিছু বেশি ছাত্রপিছু বরাদ্দ শিক্ষকের সংখ্যা মাত্র একজন। পঠনপাঠনের সার্বিক অগ্রগতির পথে এটি যে বিশেষ অন্তরায়, তা নিয়ে দ্বিমত পোষণ করার জায়গা নেই। মিড ডে মিল ব্যবস্থা চালু হওয়ার পর থেকে রাজ্যের প্রতিটি জেলায় প্রাথমিক-উচ্চ প্রাথমিক স্তরে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। কিন্তু সে-অনুপাতে শিক্ষক সংখ্যাও বাড়েনি, পরিকাঠামোরও উন্নত হয়নি। যদিও উন্নয়নের সিদ্ধান্ত এবং প্রতিশ্রুতির অভাব নেই স্কুলশিক্ষা মন্ত্রক-এর তরফে, কিন্তু তাতে কাজের কাজ কতটা হবে, সে বিষয়ে অতীত অভিজ্ঞতা খুব একটা সুখকর নয়।

বুনিয়াদি স্তর থেকেই যদি দুর্নীতি এবং অব্যবস্থা শিক্ষাব্যবস্থাকে এমন পাকে-পাকে জড়িয়ে ধরে, তবে তা দুশ্চিন্তার বইকি। নিজেদের অক্ষমতা ঢাকা দিতে সরকারপক্ষের অত্যন্ত প্রিয় বুলি, 'পশ্চিমবঙ্গ বাদে সারা ভারতই নাকি পশ্চিমবঙ্গকে কোণঠাসা করার জন্য 'লবিবাজি'-তে ব্যস্ত, সে লেখাপড়াতেই হোক বা খেলাধুলাকেই হোক!' দীর্ঘ শাসনকালে শিক্ষাব্যবস্থাকে যেখানে নামিয়ে এনেছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার, এ সাফাই আর বেশিদিন চলবে কি?

■ **দেশ ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১১**

অনাহারের জেরে.... *১ পাতার শেষাংশ.....* পারে অ্যানিম্যাল প্ল্যানেটের মতো চ্যানেলগুলি। বলছিলেন গাজোলের ব্লক তৃণমূল সভাপতি রাহানুর আলম। ....আর দেওতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সিপিএমের ফারাদ হোসেন বলছেন, ''বহু গ্রামেই গরিব মানুষ আছেন। পঞ্চায়েত সামর্থ্য অনুসারে কাজ করে। রোজ সবাইকে খেতে দেবে, এমন স্কিম বা প্রকল্প নেই পঞ্চায়েতে।''

বানদিঘির ৭৫ জন মহিলা গণস্বাক্ষর করে পঞ্চায়েতকে জানিয়ে দিয়েছেন, ''আমাদের শিশুদেরকে নিয়ে নাও, বিনিময়ে খাবার দাও।'' অনাহারক্লিষ্ট শিশুদের অনেকেই অসুখে ভুগছে। অপুষ্টিজনিত কারণে মায়েদেরও শরীর চলছে না। শিশুর বিনিময়ে খাবারের আর্জিতে পঞ্চায়েতের কেউ কর্ণপাত করেনি। এদিন তাই ১০৫টি শিশুকে স্বেচ্ছায় বিক্রি করার জন্য মেলা বসিয়ে খদ্দেরদের উচ্চস্বরে আহ্বান জানাচ্ছিলেন মালতী হেবব্রম, দেবী সোরেন, মিনতি মুর্মুরা। মেলায় শামিল ছিলেন বাড়ির গৃহকর্তা রবি হাঁসদা, শিবলাল হাসদা, বাবলু হাঁসদারাও। মালতীদেবীর একমাত্র মেয়ে অর্চনার বয়স মাত্র পাঁচ বছর। পেটের জ্বালা সইতে না পেরে অর্চনাকে বিক্রি করে দিতে চান মালতী হেমব্রম। দেবী সোরেন এসেছিলেন তিন ছেলেমেয়ে রাজু, সনিয়া ও সনেকাকে সঙ্গে নিয়ে। দুই মেয়েকে এনে ছিলেন মিনতি মুর্মু। প্রায় ৫০ জন মহিলা তাঁদের ১০৫টি শিশুকে নিয়ে দিনভর মেলা বসিয়েও খদ্দের খুঁজে পাননি। পঞ্চায়েত প্রশাসনকে এবার তাঁদের হুমকি, ''শিশুদেরকে এবার পঞ্চায়েত অফিসে নিয়ে গিয়ে ফেলে দিয়ে আসব।''

এদিনই শিশু বিক্রির মেলার খবর পেয়ে গাজোলের বিডিও-কে গ্রামে যেতে নির্দেশ দেন অতিরিক্ত জেলাশাসক (সাধারণ) তরুণ সিংহরায়। উত্তর মালদহের সাংসদ মৌসম নুর ও জেলা পরিষদের সভাধিপতি সাবিনা ইয়াসমিন বলেন, ''আমরা নিজে ওই গ্রামে গিয়ে ব্যবস্থা নেব।''

(মালদহ থেকে বাবলু হকের প্রতিবেদন, - **সংবাদ প্রতিদিন ০৮.০১.২০১১**)

যমজ মেয়ে নিয়ে লড়াই সেরিনার

দেবারতি সিংহচৌধুরী

জিততে পারবেন কি না, জানেন না। তবুও লড়তে চান তিনি।

লেখাপড়া তেমন শেখার সুযোগ হয়নি। রোজকারও নেই। শুধু মনের জোরটাই সম্বল তাঁর। মনের জোরের সেই 'পুঁজি'-তেই যমজ মেয়েকে লেখাপড়া করাতে চান সেরিনা বিবি।

শ্বশুরবাড়ির অত্যাচারে ঘর ছাড়তে হয়েছে সেরিনাকে। সেরিনার 'অপরাধ' কী? শ্বশুরবাড়ির বক্তব্য, ''এক সঙ্গে দু'দুটি মেয়ের জন্ম দিয়েছে সে।'' আর সেখান থেকেই লড়াই শুরু হয়েছে ২২ বছরের সেরিনার।

সেরিনার পড়াশোনা সপ্তম শ্রেণি পর্যন্ত। যমজ মেয়ে হওয়ার পরে শ্বশুরবাড়ির অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে বাপের বাড়িতে এসে উঠেছেন তিনি। চার-চার বার পুলিশের কাছে অভিযোগ জানিয়েছেন। অভিযোগ জানিয়েছেন রাজ্যের মহিলা কমিশনেও। সেরিনা বলেন, ''আর ফিরে যেতে চাই না শ্বশুরবাড়িতে। একটা কাজ জোগাড় করতে হবে। মেয়ে দু'টোকে পড়াশোনা শিখিয়ে মানুষ করতে চাই।''

বারাসতের কাজিপাড়ায় টালির ছাউনির ঘরে মা, বাবা, দাদা-বউদির সংসারই এখন আশ্রয় সেরিনার। কেন ফিরে যাবেন না স্বামীর কাছে? সেরিনা বলেন, ''শ্বশুরবাড়িতে গেলেই ওরা আমায় মেরে ফেলবে।'' মেয়ে দু'টো সামনে খেলে বেড়াচ্ছিল। নাতনিদের সামলাতে সামলাতে সেরিনার বৃদ্ধ বাবা মহম্মদ আলি বললেন, ''মেয়েকে আর শ্বশুরবাড়ি পাঠাতে চাই না। যেভাবেই হোক, নিজের কাছেই রাখব ওদের।'' সেরিনা বলেন, ''রাতে ফিরে আমার মুখে কাপড় গুঁজে, ইলেকট্রিকের তার দিয়ে হাত-পা বেঁধে মারত আমার স্বামী। চুল ধরে টানতে টানতে রাতে বাইরে বের করে দিত।'' মারের হাত থেকে রেহাই পায়নি শিশুরাও। সেরিনা বলেন, ''এক মেয়েকে তো একদিন রাতে রাস্তায় ফেলে দিয়েছিল শাশুড়ি। পড়শিরা দেখতে পেয়ে তাকে বাঁচায়।'' সেরিনার অভিযোগের ভিত্তিতে স্বামী সাবির আলি মণ্ডলকে গ্রেফতার করেছিল দেগঙ্গা থানার পুলিশ। কিন্তু ২৮ দিন পরে জামিনে মুক্তি পান তিনি। তার পরেই সাবির তাঁর বিরুদ্ধে সব অভিযোগ তুলে নেওয়ার জন্য তাঁর উপর চাপ সৃষ্টি করেছে বলে অভিযোগ সেরিনার।

সেরিনার অভিযোগ নিয়ে সাবিরের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে, বিষয়টিকে গুরুত্বই দিতে চাননি তিনি। সেরিনা নামে কাউকে তিনি চেনেন না বলেই দাবি সাবিরের। তিনি বলেন, ''কে বলল এ সব কথা আপনাদের? আমার তো বিয়েই হয়নি। বিয়ের আগেই বউকে মারব কীভাবে।'' এলাকার মানুষ অবশ্য সাবিরের কথা সমর্থন করেননি। নাম প্রকাশ না করে সাবিরের এক প্রতিবেশী বলেন, ''সেরিনার সব অভিযোগই সত্যি। যমজ মেয়ে হয়েছে বলে মেয়েটাকে ওরা মেরেধরে বাড়ি ছাড়া করেছে। এখন ফের বিয়ে করার চেষ্টা চালাচ্ছে সাবির।'' আর পুলিশি গাফিলতির অভিযোগ শুনে উত্তর ২৪ পরগনার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মহম্মদ হোসেন মির্জা বলেন, ''মূল অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। মামলাটির চার্জশিট হয়েছে। কিন্তু তারপর আর দেগঙ্গা থানার পুলিশ বিষয়টি নিয়ে গা করেনি। এটা ঠিক হয়নি। সব অভিযোগ খতিয়ে দেখে এই মহিলার স্বামীকে ফের গ্রেফতারের নির্দেশ দিয়েছি।''

সেরিনার গর্ভে এখন সাত মাসের সন্তান। সে মেয়ে বা ছেলে যা-ই হোক, তাকেও নিজের সামর্থেই বড় করতে চান তিনি। কিন্তু কীভাবে পারবেন, জানেন না সেরিনা নিজেই। ভাল ভাবে বাঁচার রাস্তা পেতেই তাই সেরিনা দ্বারস্থ হয়েছেন মহিলা কমিশনের।

এখন কী করবে কমিশন? কমিশনের চেয়ারপার্সন মালিনী ভট্টাচার্য বলেন, ''প্রথমে দু'পক্ষকে ডেকে পাঠিয়ে মীমাংসার চেষ্টা করব। না হলে মেয়েটি কী চায়, সেই ভিত্তিতে আইনি পরামর্শ দেব। স্বামী-বিচ্ছিন্না মুসলিম মহিলাদের জন্য এখন থাকার ও রোজকারের বিভিন্ন প্রকল্প রয়েছে। প্রয়োজনে সেই পরামর্শও দেওয়া হবে ওঁকে।''

তবে এ রকম লড়াই করতে গেলে মেয়েদের সচেতনতা আরও বাড়াতে হবে বলে মনে করছেন সমাজতাত্ত্বিকরা। সমাজতত্ত্ববিদ অভিজিৎ মিত্রর কথায়, ''মেয়ে হওয়ার পরে শ্বশুরবাড়িতে অত্যাচারটা শুরু হয়, মেয়ের বিয়ে দিতে হবে, এই 'আতঙ্ক' থেকেই। সেটা এখনও সমাজের মন থেকে মুছে যায়নি। সকলে এ ব্যাপারে সচেতন না হলে এমন ঘটনা বন্ধ হওয়া মুশকিল।''

কিন্তু সন্তান ছেলে হবে না মেয়ে, তার পিছনে যে মানুষের কোনও ভূমিকা নেই, তা স্পষ্ট করে দিয়ে স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ আরতি বসুসেনগুপ্ত বলেন ''ছেলে হবে না মেয়ে, এর পিছনে মানুষের কোনও ভূমিকা থাকে না। এটা পুরোপুরি একটা বিজ্ঞান। সেই বিজ্ঞানটাই বুঝতে হবে সকলকে। একে অপরকে বোঝাতেও হবে।''

যতদিন সেই বোধটুকু না আসবে, ততদিন লড়াই চালাতে হবে সেরিনার মতো অসংখ্য মেয়েদের।

- *আনন্দবাজার পত্রিকা* **২১.১.১১**

স্বাস্থ্যের অধিকার

■ পার্থসারথি দাশ ■

জনকল্যাণকর একটি গণতান্ত্রিক সরকারের কাজ কল্যাণকর পরিষেবাগুলি জনসাধারণকে দেবার পুরো দায়িত্ব নেওয়া। খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থান-স্বাস্থ্য ও শিক্ষার মৌলিক অধিকারগুলি থেকে সাধারণ মানুষ যাতে বঞ্চিত না হয় তা দেখার দায়িত্ব নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত সরকারের। কিন্তু একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের শেষভাগে দাঁড়িয়ে আমরা দেখছি সরকার ও পুঁজিপতিদের মেলবন্ধন ক্রমাগত অধিকাংশ মানুষকে তাদের সাংবিধানিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করেই চলেছে।

শরীর থাকলেই তাকে রক্ষা করার প্রশ্ন ওঠে। শৈশব থেকে বার্ধক্য অবধি সারাজীবন জুড়ে নানা রোগব্যাধি মানুষের জীবনকে বিপর্যস্ত করে। তার জন্য রোগের নিরাময় ব্যবস্থা করে স্বাস্থ্যরক্ষার, সুস্থতা - দেহের ও মনের - রক্ষা করার ব্যবস্থা করতে হয়। আর মানুষের সুস্থতা বজায় রাখতে জনকল্যাণকর সরকারগুলি স্থাপন করে সরকারি হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্র। আজকের দিনে মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে স্বাস্থ্য দপ্তর। সীমাহীন দুর্নীতির আশ্রয় নিচ্ছে মন্ত্রী থেকে আমলারা, হাসপাতাল কর্মীরা - এমনকি কিছু কিছু ডাক্তারবাবুরাও। প্রাইভেট নার্সিং হোমে ব্যবসা করা ডাক্তারবাবুরা হাসপাতালের দরিদ্র রোগীকে পরিষেবা না দিয়ে অর্থবান রোগীকে নার্সিং হোমে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করে ব্যবসা করেন। অসাধু ওষুধ কোম্পানীর নিম্নমানের ওষুধকে কিনে চড়া মুনাফা করে সরকারি আমলারা আর সে ওষুধ খেয়ে গরিব রোগগ্রস্থ শিশু থেকে বৃদ্ধ সকলে মরে। অর্থের কৌলীন্য না থাকলে রোগীর যথাসময়ে অস্ত্রোপাচার হয় না। মন্ত্রী-আমলার সুপারিশ না থাকলে মরনাপন্ন রোগীকে হাসপাতালে ভর্তি নেওয়া হয়না। নার্সিং হোমগুলোর দুর্নীতির ষোলোকাহন বর্ণনার স্থান অন্যত্র। কিন্তু আজকাল স্বাস্থ্যব্যবস্থা নিয়ে বীতশ্রদ্ধ ক্ষুব্ধ মানুষ এতটাই অধৈর্য হয়ে পড়েছে যে, সামান্যতম কোনো ঘটনায়ও তারা ধৈর্য রাখতে পারছে না। হাসপাতালে ভাঙচুর, ডাক্তার-নার্সদের মারধর করে প্রায়শই কেলেঙ্কারী কাণ্ড বাধাচ্ছে। অথচ ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীরা নির্বিকার। মানুষ মরছে কিন্তু পার্টিফাণ্ডে টাকা আসছে, বেনামে নার্সিংহোম, জাল ওষুধের কারখানার রমরমা কারবার চলছে - বানতলায় স্বাস্থ্যকর্মী খুন যার বিস্ময় ফল।

হাসপাতাল আছে - ডাক্তার নেই, নার্স নেই, ওষুধ নেই, ওষুধ পাচার হয়ে যাচ্ছে, পথ্যব্যবস্থায় ব্যাপক দুর্নীতি, পরীক্ষার যন্ত্রপাতি বিকল এমনি কত কি - অভিযোগ প্রতিটি পদক্ষেপে। আউটডোরে ডাক্তার নেই - কোয়ার্টারে প্রাইভেট প্র্যাকটিশ করছেন, রোগী কাতরাচ্ছে, নার্স নেই। হাসপাতালে পানীয় জল নেই, অ্যাম্বুলেন্স অকেজো।

আরো হাজারো অব্যবস্থা নিয়ে মানুষের স্বাস্থ্যের অধিকার পূরণ করছেন আমাদের সরকার ও সহযোগীরা। বাঁচিয়ে রাখাতে ভেজাল, বেঁচে থাকাতেও ভেজাল। সংবিধান প্রদত্ত স্বাস্থ্যের অধিকার রক্ষার দায়িত্ব তো জনসাধারণকেই নিতে হবে।

Health bill may deny the poor free care

February 22, 2010

The Centre has drafted a health bill to ensure the right to health. However, health experts feel the bill will, instead, legitimise denial of health services to the poor.

The Draft National Health Bill 2009 was prepared on the recommendations of the National Human Rights Commission to recognise and operationalise the right to healthcare. The demand for such a right was led by the Jan Swasthya Abhiyan, the Indian chapter of the global Public Health Movement.

The bill is important as India's health indicators are worse than its poorer neighbours. The country has one of the lowest public spendings on healthcare. While the UPA government had committed to increase the spending to two-three per cent of the GDP, the increase has been from 0.96 per cent to 1.05 per cent. This places India in the league of Burundi, Sudan and Myanmar.

India currently does not have any law to ensure healthcare to its people. The UK, Canada, Brazil, Thailand, Malaysia, Sri Lanka and the developed nations have such laws.

The bill is ambiguous on providing universal and free healthcare, experts said. It talks of providing free access to healthcare only for the vulnerable and marginalised. By this, the bill legitimises a system in which the poor can't access free healthcare if they don't fall under the targeted sections.

Those outside the purview of the targeted sections will have to cough up a fee to utilise these services. The fee will have to be "affordable", experts said.

"Targeting vulnerable groups perpetuates and condones vulnerability rather than addressing the issue. Targeting programmes are no substitute for universal healthcare," Dr K. Srinath Reddy from the Public Health Foundation of India, said.

However, the bill can be used to generate demand for higher health spending. The concept can also be used to demand changes in other sectors, the experts added. For example, it is known that wider income disparity leads to an adverse impact on health - universal entitlement to healthcare can be used to file public interest litigations to demand an increase in minimum wages and decrease the income gap.

Even a trade policy which would have an adverse impact on the right to health can be challenged if there is such a law, Reddy said.

"It is a known fact that a universal system reaches more marginalised people. The public distribution system collapsed as it was directed," Biraj Patnaik, who played a leading role in the Right to Food campaign, said.

The bill also fails to prevent public health services being privatised. "It should assert the role of public sector health services. But, it does not talk about strengthening of the services," Colin Gonsalves, a human rights activist, said.

The Constitution of India on the right to health care

The Constitution of India has provisions regarding the right to health. They are outlined the Directive Principles of State Policy- Articles 42 and 47, outlined in Chapter IV, and are therefore non-justiciable.

Article 42: "**Provision for just and humane conditions of work and maternity relief**- The State shall make provision for securing just and humane conditions of work and for maternity relief"

Article 47: "**Duty of the State to raise the level of nutrition and the standard of living and to improve public health-** The State shall regard the raising of he level of nutrition and the standard of living of its people and the improvement of public health as among its primary duties and, in particular, the State shall endeavour to bring about prohibition of the consumption, except for medicinal purposes, of intoxicating drinks and of drugs which are injurious to health"

The Constitution incorporates provisions guaranteeing everyone's right to the highest attainable standard of physical and mental health. Article 21 of the Constitution guarantees protection of life and personal liberty to every citizen. The Supreme Court has held that the right to live with human dignity, enshrined in Article 21, derives from the directive principles of state policy and therefore includes protection of health Further, it has also been held that the right to health is integral to the right to life and the government has a constitutional obligation to provide health facilities.

Failure of a government hospital to provide a patient timely medical treatment results in violation of the patient's right to life. Similarly, the Court has upheld the state's obligation to maintain health services.

★

First in India: Assam introduces bill for right to health

March 17, 2010

Assam became the first state in the country to introduce a bill guaranteeing the right to health and well-being.

Responding to an appeal from the Centre for legislating on health rights, the state government tabled the landmark Assam Public Health Bill, 2010, in the assembly.

The bill, which will be put to vote on March 31 and should sail through, proposes path-breaking provisions for health equity and justice to achieve the goal of health for all. It makes it mandatory for all new development projects to carry out a health impact assessment. It also proposes to make it compulsory for both government and private hospitals to provide free healthcare services and maintain appropriate protocol of treatment for the first 24 hours to an emergency patient.

The statute seeks to bind the state health and family welfare department legally to meet its obligations - coordination with other departments concerned and providing people with minimum nutritionally adequate essential food, adequate supply of safe drinking water, sanitation through appropriate and effective sewage and drainage systems and access to basic housing facilities.

The bill provides for the health and family welfare department to take appropriate legal steps for fixing responsibility and accountability of departments and agencies concerned in case of repeated outbreaks or recurrence of communicable, viral and water-borne diseases, which are found in a particular area and proved to have taken place because of the failure to improve sanitation and safe drinking water facilities.

রবি রায় কর্তৃক সম্পাদিত এবং ওয়েষ্ট বেঙ্গল এডুকেশন নেটওয়ার্ক-এর রাজ্য কমিটির পক্ষে স্বপন পণ্ডা কর্তৃক ৬০এ/২ ব্যানার্জী পাড়া লেন, ঢাকুরিয়া, কলিকাতা-৭০০০৩১ হইতে প্রকাশিত।
দূরভাষ-০৩৩-২৪০৫ ৫৩৩৪, ই-মেল:wbenwb@gmail.com, ওয়েবসাইট: wben.info মুদ্রণে: প্রী প্রেস, কলকাতা-৭০০ ০৭৮, দূরভাষ : ২৪০৫ ১৮৭৮ *অনুদান : ২ টাকা*

কেবলমাত্র সভ্য ও সমর্থকদের মধ্যে বিতরণের জন্য